

ভবেশ স্যার

মোহাম্মদ হযরত আলী

অনেক দিন পর ভবেশ স্যারের চিঠি পেলাম। স্যার চিঠিতে জানিয়েছেন, আগামী রবিবার তার একমাত্র মেয়ে উপমাকে পাত্র পক্ষ দেখতে আসবে। আমি যেন চিঠি পাওয়া মাত্র বাড়ি চলে আসি। তাই দুই দিনের ছুটিতে বাড়িতে গেলাম।

দুই ছেলে এক মেয়ের জনক ভবেশ স্যার। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্যারের দুই ছেলে এবং ছেলেদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা ইনডিয়া চলে গেছে। যাওয়ার সময় স্যারের পুত্র ও পুত্রবধূরা স্যারকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনেক কাকুতিমিনতি করেও রাজি করাতে পারেনি। স্যার তাদের বলেছিলেন, নিজের দেশ ছেড়ে অন্যের দেশে গিয়ে ভাড়াটিয়া নাগরিক হতে তোরা যেতে চাস, তাহলে যা। কিন্তু আমি আমার মাতৃভূমি ছেড়ে, পৈতৃক বসতভিটা ছেড়ে, এই প্রিয় বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাবো না।

স্যারের অনমনীয় মনোভাবের উত্তরে বড় ছেলে স্যারকে বলেছিল, যে দেশে স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে বছরের পর বছর বিতর্ক চলে, স্বাধীন রাজনীতিকরা দল ও মতের উর্ধে থেকে দেশের স্বার্থে, মানুষের কল্যাণে এক কাতারে দাড়িয়ে হাতে হাত রেখে, কাধে কাধ মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে না, সে দেশের অন্ধ ভালোবাসার মোহে মুখ থুবড়ে তুমি পড়ে থাকতে পারো বাবা, আমরা থাকবো না। যদি কখনো তুমি তোমার মত পাল্টাও তবে চিঠি লিখে জানিও, আমরা এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। সেদিন স্যার দেশের ভালোবাসার কাছে সন্তানের ভালোবাসাকে চোখের জলে নীরবে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

হাই স্কুলে ১৯৯০-৯১ সেশনে ভবেশ স্যার আমাদের বাংলা পড়াতেন। তখন প্রতি সপ্তাহে একদিন ক্লাস পরীক্ষা হতো। সপ্তাহের ছয় দিনের পড়া থেকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেয়া হতো। ছয় দিনের পড়া ছাড়াও স্যার রাষ্ট্রনীতি ও স্বাধীনতা প্রবন্ধ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন – এই উদ্ধৃতিটি প্রায় প্রতি সপ্তাহের ক্লাস পরীক্ষার প্রশ্নে বাধ্যতামূলক ব্যাখ্যা হিসেবে আমাদের উত্তর দিতে বলতেন। ব্যাখ্যাটির উত্তরে সবচেয়ে বেশি নাস্তার পেতো মহেন্দ্র ও মাইকেল। খাতা দেয়ার সময় স্যার মহেন্দ্র ও মাইকেলের ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং বলতেন, তাদের হাতে কোনো দেশের নেতৃত্ব থাকলে সে দেশের স্বাধীনতা কখনো ভুলুষ্ঠিত হবে না।

বাংলায় পণ্ডিত হলেও ইংরেজিতে অভাবনীয় দখল ছিল ভবেশ স্যারের। আমি তার কাছে ইংরেজি প্রাইভেট পড়তাম। প্রতিদিন প্রাইভেট পড়ে কেমন করে যেন অনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে স্যারের ফ্যামিলির একজন হয়ে গিয়েছিলাম। তাই- পূজাপার্বণ ছাড়াও যে কোনো অনুষ্ঠানে স্যার আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন। এমনকি পরামর্শ চাইতেন, তদারকির দায়িত্বও দিতেন।

পাত্র পক্ষ কনেকে পছন্দ করেছে। তারা বিয়ের তারিখ ঠিক করে উপমাকে আংটি পরিয়ে গেছে। স্যারের বাসায় আমার ব্যস্ত দুটি দিন অতি দ্রুত কেটে গেল। এবার আমার কর্মস্থলে ফেরার পালা। ভোরের প্রথম বাসে কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। রাতে ব্যাগ গোছানোর সময় মা এসে বললেন, আর একটা দিন থেকে যা না বাবা।

বললাম, সম্ভব নয় মা। ছুটি শেষ।

মা উদ্বেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন, সাতটার টিভি খবরে শুনলাম জেএমবি আজ গাজীপুরে বোমা হামলা করেছে। জেএমবির আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা যেভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে তাতে কখন কোথায় কোন অঘটন ঘটাবে তা কেউ বলতে পারে না। গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তায় চলাফেরা করিস তাই একটু সাবধানে যাস বাবা।

আমি মাকে অভয় দিয়ে বললাম, চিন্তা করো না মা, হায়াত মউত আল্লাহর হাতে। আল্লাহ যার মৃত্যু যেখানে যেভাবে লিখে রেখেছেন মানুষের সাধ্য নেই তা রোধ করার।

আমার কথা শেষ না হতেই কোথা থেকে যেন মলি এসে হাজির হলো এবং আমার কথার জের ধরে স্কুলের ম্যাডামদের মতো আমাকে বললো, হায়াত মউত আল্লাহর হাতে কথাটা যেমন শতভাগ সত্যি তেমনি আরেকটা সত্য তোমার জেনে রাখা দরকার। তা হলো, হুশ হও বান্দা, মউত দিমু আমি। অর্থাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খোলা রেখেই পথ চলতে হয়।

এরপর মলি মায়ের পাশে গিয়ে বসলো এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে মাকে বললো, তুমি তো জানো না খালা, তোমার ওই সোনার চানের সঙ্গে ছাগলের পার্থক্য শুধু পায়ে আর লেজে।

মা মলির মাথায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে আমাকে ছাগল থেকে মানুষ বানানোর অভিপ্রায়ে খুব শিগগিরই আমার দায়িত্ব স্থায়ীভাবে মলির হাতে তুলে দেবেন বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মৃদু হেসে চলে গেল।

মায়ের অনুপস্থিতিতে মলি আমার ব্যাগ গুছিয়ে দেয়ার ছলে ব্যাগ থেকে আমার সব জামা-কাপড় বের করলো এবং সময় নষ্ট না করে জামা-কাপড়ের ভাজগুলো ভেঙে অগোছালো করে আমাকে ভেংচি কেটে অতি দ্রুত বাসা থেকে বেরিয়ে গেল।

উপমার বিয়ের একদিন আগে সন্ধ্যায় মা আমাকে ফোন করে জানালো, ঢাকা থেকে মেয়ের বিয়ের সওদা আনতে গিয়ে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ভবেশ স্যার মারা গেছেন। আমি যেন আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা চাপা কষ্ট বুকে বাসা বাধলো। স্যারের মৃতদেহ সংস্কারের জন্য রাতের বাসে বাড়ির পথ ধরলাম।

জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা থেকে

এক তরফা

বিভা চৌধুরী

প্রেম সবার জীবনে আসে। কিন্তু সে প্রেম হয় পারস্পরিক। আমার প্রেম ব্যতিক্রমী। আমি সমস্ত হৃদয় উজাড় করে তাকে ভালোবেসেছিলাম।

তখন আমি যৌবন ছুই ছুই ষোড়শী বলা যায়। মনে প্রাণে তাকে চেয়েছি। তার মধ্যে আবার তার পড়াশোনায় অসাধারণ কৃতিত্ব আমাকে পাগল করে তুলেছিল (আত্মীয়ের মধ্যে বটে)। দুঃখের বিষয়, একাই সেই ভালোবাসার নায়িকা ছিলাম। সে যে এতোটাই বিমুখ ছিল তা আমার ব্রেইনে আসেনি। সত্যিকার অর্থে, আমারই ভালোবাসা প্রবল ছিল। সেটাকে One side affection বলা চলে বোধহয়।

ভালোবাসা কখনো এক পক্ষ সমর্থনে হয় না। আমার আচরণ লক্ষ্য করে এরই মাঝে আমার পরিবার থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়। তাদের সম্মতি সাপেক্ষে বিয়ের আয়োজন চলে মোটামুটিভাবে। তখন আমি অনার্স ক্যান্ডিডেট। যাহোক, বেশ শোরগোল পড়ে গেছে যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে। সবাই খুশি। আমিও খুশি। কি করবো ভেবে পাই না। নিজেকে আরো পরিপাটি করে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কাক্সিত বাসনায় পৌছাতে।

কিন্তু হায় বিধি! নির্ধারিত তারিখে সে ফেরেনি। এক দীর্ঘ চিঠি এসেছে। চিঠির বিষয়বস্তু, তার গত মাসে বিয়ে হয়ে গেছে পছন্দের এক মেয়ের সঙ্গে। এরপর আমার পা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। ঘন ঘন হৃদকম্পন। দীর্ঘ চার বছর মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম। এই আমার একতরফা প্রেমের পরিমাণ।

তাই আজ সবাইকে অনুরোধ, *মন না জেনে ভবে পিরিত কইরো না*। পৃথিবীতে আজ চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। যা চেয়েছি তা পাইনি, যা পেয়েছি তা চাইনি। তারপরও একটি সান্ত্বনা যে অন্তত জেনেছি, পৃথিবীতে নর-নারীকে যে প্রেম ঈশ্বর দিয়েছে তার সবটুকুই তাকে দিতে পেরেছি। ভালোবাসা দিবস এলে সেই হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে এখনো খুজি।

বগুড়া থেকে

অবত্তি

রাজিব ফেরদৌস

ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে অশোক কুমার সিদ্ধান্ত নিলেন আজকেই সিরাজগঞ্জ যাবেন। যেভাবেই হোক। অবশ্য কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে ভেবেছিলেন আজকের দিনটা ঢাকাতেই কোনো হোটেলে থেকে যাবেন। কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। পুরো দিন পড়ে আছে। অহেতুক ঢাকায় পড়ে থাকার কোনো মানে তিনি খুজে পেলেন না। তাছাড়া যার জন্য, যে উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন, পয়ত্রিশ বছরের প্রতিশ্রুতি সেই দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনীর অবসান ঘটানোর জন্য আর এক মুহূর্ত দেরিও যেন তার সহিছিল না।

এয়ারপোর্টের ঝামেলা চুকিয়ে অশোক কুমার রাস্তার ধারে এসে দাড়ালেন। রাস্তার ওপারে ইলেকট্রিক তারের ওপর একটি শালিক অলসভাবে বসে ছিল। তিনি ভাসা ভাসা চোখে সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন কিভাবে যাবেন সিরাজগঞ্জে। ঢাকার কোন জায়গা থেকে কোন গাড়িটি যায় সিরাজগঞ্জের দিকে তা মনে করতে পারছেন না। ঢাকায় তিনি একবারই এসেছিলেন। পয়ত্রিশ বছর আগে। তখন বয়স ছিল আঠারো বছর। দুই বোন তাপসী, শঙ্করী, মা আর বাবা অনিল কুমারের সঙ্গে। সিরাজগঞ্জ থেকে লঞ্চে ভূয়াপুর, সেখান থেকে বাসে ঢাকার কমলাপুর স্টেশন। ঢাকায় আসা বলতে ওটুকুই। তারপর আবার ট্রেন, হেটে সীমানা পাড়ি দেয়া। ট্রেন, বাস এভাবে কলকাতার ঘিঞ্জি শহরের চার দেয়াল। অশোক কুমারের মনে পড়ে তারা যেদিন কলকাতার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়েন সেদিন এগিয়ে দেয়ার জন্য ঘাট পাড়ে প্রতিবেশী অনেকেই উপস্থিত ছিল।

তারপর এক সময় হুইসল বাজিয়ে লঞ্চ ছেড়ে দেয়। নদীর পাড়ে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকা মানুষগুলো একটু একটু করে দূরে সরে যেতে থাকে। সেদিন সেই মানুষদের ভিড়ে তার ব্যস্ত চোখ শুধু খুজেছিল একজনকে, সে অবত্তি— যাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন ফিরে আসবেন। অবশ্যই ফিরে আসবেন। পালিয়ে হলেও ফিরে আসবেন। কিন্তু সেদিন সেই নদীর পাড়ের মানুষদের ভিড়ে তিনি অবত্তিকে খুজে পাননি। অশোক কুমার ভেবে চলেন, তিনি কি কথা রেখেছেন?

আজ এই পয়ত্রিশ বছর পর, মাথায় কাচা পাকা চুল, চোখে পুরু কাচের চশমা আর ঈষৎ কোচকানো গায়ের চামড়া নিয়ে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসাকে তিনি কি সেই আঠারো বছরের যুবকের ফিরে আসার সঙ্গে তুলনা করবেন? এই ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিই কি অবত্তিকে দিয়েছিলেন? রিনরিনে হাসি আর টানা টানা চোখের সেই চঞ্চল বালিকাটি কি তার এই ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছে এখনো?

স্যার যাবেন কই?

একটি ট্যাকসির ভেতর থেকে ড্রাইভারের গলার আওয়াজে অশোক কুমারের ভাবনার পেয়ালা ঝনাৎ করে ভেঙে যায়। তিনি রাস্তার ওপারে ইলেকট্রিক তার থেকে চোখ নামিয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকান। ততক্ষণে শালিকটি উড়ে গেছে দূরে কোথাও। তিনি একটু এগিয়ে যান ট্যাকসির দিকে। তারপর জানালায় একটু বুকু প্রশ্ন করেন, তাই আমি সিরাজগঞ্জ যাবো। কিভাবে যাবো বলতে পারেন?

ড্রাইভার কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দেয়, আপনি মহাখালী যেতে পারেন সেখান থেকে সিরাজগঞ্জ—পাবনার গাড়ি পাবেন। গেলে ওঠেন।

অশোক কুমার আর কথা বাড়ান না। ট্যাকসিতে উঠে বসেন।

ট্যাকসির জানালা দিয়ে ঢাকার যতটুকু দেখা যায় তিনি তাই দেখতে থাকেন। কলকাতার খবরের কাগজগুলো এখন প্রায়ই ঢাকার কথা, বাংলাদেশের কথা লেখে। একটি ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠির তৎপরতায় দেশ জুড়ে যে বোমাবাজি হচ্ছে তার কথা লেখে। এসব কিছুই আজ তাকে ভাবায় না তবে তার বুক মাঝে মাঝে ঈষৎ কেপে ওঠে। সেটা বোমা খেয়ে মরার ভয়ে নয়, অবত্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার উত্তেজনা। আজ

এতোদিন পর অবন্তি কি তাকে চিনতে পারবে? সে কি তাকে মনে রেখেছে? এক জীবনে মানুষ তো কতো কিছুই মনে রাখে না।

যে অবন্তির কোলে মাথা রেখে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, স্কুল ফাকি দিয়ে যে অবন্তি তার কলেজের গেটে এসে প্রায়ই দাড়িয়ে থাকতো, যাকে নিয়ে তিনি যমুনার পানিতে নৌকা ভাসাতেন, সেই অবন্তি কি এই সব কিছুই ভুলে বসে থাকবে? ভোলা কি যায় কখনো? তিনি তো পারেননি। কলকাতায় তার স্ত্রী, সংসার, ছেলেমেয়ে, টাকা-পয়সা, সুখ, শান্তি সবই হলো, তারপরও তো তিনি অবন্তি নামের বালিকাটির স্মৃতি লালন করছেন বুকের খুব গভীরে, যত্ন করে।

মহাখালী থেকে অশোক কুমার সিরাজগঞ্জের যে গাড়িতে উঠে বসেন সেটির নাম যমুনা। আহ যমুনা! অশোক কুমার পরম তৃপ্তিতে কয়েকবার উচ্চারণ করেন নামটি। সিরাজগঞ্জের শিবপুরে যেখানে তাদের বাড়ি ছিল তার পাশ দিয়েই কলকল শব্দে বয়ে যেত যমুনা নদী। সেই নদীতে সাতরে কেটেছে তার শৈশব-কৈশোর। অবন্তিকে নিয়ে কতোবার নৌকা ভাসিয়েছেন যমুনার জলে! মাঝ নদীতে গিয়ে তিনি একটু মজা করতেন। ইচ্ছা করেই নৌকা দোলাতেন আর অমনি অবন্তি ভয়ে চিৎকার করে তাকে জড়িয়ে ধরতো। তার বুকে মাথা গুজতো। যেন এই বুক পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। যমুনার অথৈ জলে নৌকা ডুবলেও এ বুক কোনোদিন ডুববে না। কোনো দিন না।

অশোক কুমার বুকে হাত দেন। যেন অবন্তির শরীরের স্পর্শ এখনো লেগে আছে তার বুকে। অবন্তির গরম নিঃশ্বাস পড়ছে সেখানে। তারপর হঠাৎ তার বুকটা হ হ করে ওঠে। তিনি পাশের জানালার কাচ টেনে দেন। হ হ করে হাওয়া এসে ঝাপটা মারে তার চোখে, মুখে আর চুলে। তিনি পরম তৃপ্তিতে চোখ বোজেন।

কলকাতার পয়ত্রিশ বছরের জীবন যেন তাকে শ্বাস রোধ করে রেখেছিল। আজ নিজের দেশের বাতাসে তিনি বুক ভরে শ্বাস টানেন। এ বাতাসে মিশে আছে অবন্তির চুলের গন্ধ, বুকের গন্ধ। অবন্তি খোপাতে প্রায়ই গন্ধরাজ ফুল গুজে রাখতো। তার কাছে গেলেই সেই গন্ধ এসে নাকে লাগতো। আচ্ছা, অবন্তি কি এখনো খোপায় গন্ধরাজ ফুল গোজে? বাতাসে কি সেই ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়? তিনি বাতাসে ফুলের গন্ধ খুঁজে পেতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

অশোক কুমার সঙ্গে আনা একমাত্র বৃফকেসটির ঢাকনা খুলে মেলে ধরেন। প্রয়োজনীয় কিছু কাপড়, অবন্তির জন্য কেনা দুটি শাড়ি ছাড়া তেমন কিছুই নেই সেখানে। শাড়ি দুটোতে তিনি আলতো হাত বোলান। অবন্তি একবার স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠানে শাড়ি পরেছিল। অনুষ্ঠান শেষে সে অবস্থাতেই চলে এসেছিল তার কাছে। অবন্তিকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখে অশোক কুমার চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছিলেন। লজ্জায় অবন্তি লাল হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

আজ এতো দিন পর তিনি অবন্তির জন্য শাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়ি পরে অবন্তি সামনে এসে দাড়াবে। তিনি অপলক তাকিয়ে থাকবেন সেদিকে। অবন্তি লজ্জায় লাল হবে। সে কি তাকে চিনতে পারবে? যদি না চেনে? যদি তার দেয়া শাড়ি না নেয়? না নিক তবু তিনি দেবেন।

অশোক কুমার বৃফকেস হাতড়ে কাপড়ের নিচ থেকে একটি ঠিকানা বের করে আনলেন।

শ্যামল কান্ত, ধাম+পোস্ট-শিবপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

তার ছেলেবেলার একমাত্র বন্ধু। কলেজ পর্যন্ত এক সঙ্গেই ছিলেন। দেশ ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার পর বছরখানেক তার সঙ্গে চিঠি চালাচালিও হয়েছে। হঠাৎ আর কোনো খবর নেই। অনেক চিঠি দিয়েছেন তার ঠিকানায়। কিন্তু কোনো উত্তর পাননি।

উত্তর পাননি অবন্তির কাছে লেখা চিঠিরও। কলকাতায় আসার পর অবন্তির কাছ থেকে তিনি মাত্র একটি চিঠি পেয়েছিলেন। পয়ত্রিশ বছর পর আজো সেই চিঠি তার কাছে রয়ে গেছে। হয়তো থাকবে আমৃত্যু। সেই চিঠির এক জায়গায় অবন্তি লিখেছিল - আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মতো বাসিও/আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি, যখন মনে পড়ে আসিও।

হ্যা, আজ পয়ত্রিশ বছর পর অবসর হয়েছে ভালোবাসার। তাইতো তিনি কলকাতাকে পেছনে ফেলে, স্ত্রী-সন্তানকে পেছনে ফেলে চলে এসেছেন এই বাংলাদেশে। শুধু একবার এক পলক অবস্থিকে দেখার জন্য। এসেছেন তাকে দেয়া কথা রাখার জন্য। এবার তিনি ফিরে গিয়ে শান্তিতে চিতায় চড়তে পারবেন। কিন্তু অবস্থি? সে কি তার জন্য নিশিদিন পথ চেয়ে বসে আছে এখনো? হয়তো আছে। কিন্তু সে যদি তাকে দেখে বলে, এলে এতো দিন পর! এখন যে বড় অবেলা প্রিয়!

অশোক কুমার বৃক্ষকেন্দ্রের ঢাকনা লাগিয়ে শ্যামল কান্তের ঠিকানাটা পকেটে রাখলেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথমে তিনি শ্যামল কান্তের বাড়িতেই উঠবেন। যদি তাকে না পাওয়া যায় তবে বলে- কয়ে কোনো এক বাড়িতে আজকের রাতটা শুধু কাটাবেন। তারপর সকালে বের হবেন অবস্থির খোজে। একবার, শুধু একবার অবস্থির সঙ্গে দেখা করা তার খুব প্রয়োজন, খুব। সামনা-সামনি দাড়িয়ে তিনি শুধু বলতে চান- অবস্থি, দেখ আমি ফিরে এসেছি। আমি কথা রেখেছি, অবশ্যই কথা রেখেছি।

রাতের আধার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে রিকশা। রিকশায় বসে আছেন অশোক কুমার। ভাগ্যিস সিরাজগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে নেমে এমন এক রিকশাওয়ালাকে তিনি খুজে পেয়েছিলেন। নাম সোলেমান মিয়া। বয়সে তার কাছাকাছি বা দুই এক বছরের বড়ও হতে পারে। তবু গায়ে বেশ জোর। পা চালিয়েই প্যাডেল মারছে। অশোক কুমারের নিজ গ্রাম সম্পর্কে সে বেশ অবগত যদিও তার নিজের বাড়ি অশোক কুমারের বাড়ি থেকে আরো দুই গ্রাম পরে। তিনি ভীষণ এক উত্তেজনা নিয়ে সোলেমান মিয়ার সঙ্গে কথা বলছেন। সে তার বাবা অনিল কুমারের নাম জানে। শিবপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তার বাবা তাও সে জানে। অশোক কুমার গ্রামের আরো অনেক খবর নিলেন সোলেমান মিয়ার কাছ থেকে। গ্রামের নাকি এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হাই স্কুলটা আগে যেখানে ছিল এখন আর সেখানে নেই। সেখানে এখন বিশাল এলাকা জুড়ে হাসপাতাল। আরো কতো দালান উঠেছে গ্রামে!

অশোক কুমার ব্যস্ত হয়ে জানতে চান, আমাদের বাড়ি যেখানে ছিল সেই ভিটা? সে জায়গা কি তেমনি আছে?

সোলেমান মিয়া উত্তর দেয়, আরে না, কি যে কন। হেইখানে এখন সরকারি দালান হইছে না।

তিনি সোলেমান মিয়ার কাছে বলতে যান, আমাদের বাড়ির পাশে যে থাকতেন হরিনারায়ণ জ্যাঠা তার বাড়ি? তারা এখন কোথায়? তার মেয়ে অবস্থি বালা, সে?

কিন্তু তিনি এসব কিছুই বলতে পারেন না। কি এক অজানা আশংকায় বুক কেপে ওঠে। যদি সোলেমান মিয়া বলে ফেলে, তারা আর এখন ওখানে নেই, ওখানেও সরকারি দালান-কোঠা উঠেছে! অশোক কুমার আর কথা বাড়ান না। সোলেমান মিয়ার মুখ থেকে গ্রামের এ পরিবর্তনের কথা তার মোটেও শুনতে ইচ্ছা করে না।

সেই রাতে যে চমকটি অশোক কুমারের জন্য অপেক্ষা করছিল তার জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। অনেক খুজে, একে ওকে বলে-কয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি শ্যামল কান্তের বাড়িটি খুজে বের করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে শ্যামল কান্তকে দেখবেন বলে আশা করেছিলেন এ যেন সে নয়। বয়সের ভারে বাক খাওয়া এক শ্যামল কান্ত। তার চেয়েও বড় কথা তার ডান পায়ের পুরোটাই নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় গুলি লেগেছিল, তারপর কেটে ফেলতে হয়েছে। সেই যুদ্ধের সময়েই পাক বাহিনী গ্রামের অনেক লোককে হত্যা করে। তারা অবস্থির পরিবারের সদস্যকে হত্যা করে। শুধু বাচিয়ে রাখে অবস্থিকে। তারা তাকে তুলে নিয়ে যায়। আজো তার কোনো খবর মেলেনি।

জোছনা রাতে বারান্দায় বসে শ্যামল কান্ত বন্ধুর কাছে এসব বলছিলেন। পাশেই বসেছিলেন অশোক কুমার। তিনি এই চরম সত্যকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল, মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা কথা। ছলনা করছো, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে ছলনা করছো। কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি যেন কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন।

বুকের খুব গভীরে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভূত হয়। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সেই ঝাপসা চোখেই তিনি আকাশের দিকে তাকান। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ। অশোক কুমার চাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। তাতে চাদের আলো পড়ে আশ্চর্য্য দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। কোথা থেকে এক ঝাপটা বাতাস এসে গাছের পাতা নাড়িয়ে দিয়ে যায়। সেই বাতাসে ভেসে আসে গন্ধরাজের সুবাস। শ্যামল কান্ত বন্ধুর দিকে তাকান। অশোক কুমারকে ছোট শিশুর মতো অসহায় মনে হয়। দেখে তারও বুক কেপে ওঠে। তিনি পরম মমতায় বন্ধুর পিঠে হাত রাখেন। আর ঠিক তখনই অশোক কুমার শিশুর মতো ডুকরে কেদে ওঠেন। পঞ্চাশোর্ধ প্রবীণের সেই কান্না জোছনা রাতে বড়ই অদ্ভুত শোনায়।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

বহমান

মলি

তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় তিন বছর। এ তিন বছরে আমাদের মধ্যে উল্লেখ করার মতো কোনো ঝগড়া হয়নি। আমাদের আচরণ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মতো। সে থাকতো মেসে। প্রতিদিনই তার মেসে যেতাম নির্দিষ্ট সময়ে। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তার মেসে গেলাম।

সেদিন সে আমাকে বললো, আর কোনোদিন আমার এখানে আসবে না। আর কোনোভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না। আজ থেকে ভুলে যেও তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল। কোনো কারণ খুজতে যেও না।

তার কথা শুনে নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। প্রশ্ন করলাম, আমার অপরাধ?

সে বললো, তোমার কোনো অপরাধ নয়। অপরাধ আমার। কেন তোমার মতো একটা ভণ্ড মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করলাম।

নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে তার গালে কষে একটা থাপ্পড় দিলাম।

সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। প্রচণ্ড রাগে-অভিমানে চলে আসি তার কাছ থেকে।

আসার সময় তাকে অনেক অভিশাপ দিয়েছিলাম। বাসায় গিয়ে অনেক ভেবেছি, তিন বছরের সম্পর্ক এভাবে শেষ হতে পারে না কোনো কারণ ছাড়া। আমি যাবো, ক্ষমা চাবো তার কাছে। কারণ আমি যে তাকে ভালতে পারছি না।

প্রায় দেড় মাস পরে গিয়ে শুনি সে মেস ছেড়ে চলে গেছে। গ্রামের ঠিকানা আমার জানা না থাকায় তার বন্ধুদের কাছে ঠিকানা চাইলাম। কিন্তু কোনো বন্ধু আমাকে ঠিকানা তো দেয়ইনি বরং সবাই আমার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করলো। বুকে কষ্ট নিয়ে তার কথা ভুলতে চেষ্টা করি। প্রায় এক বছর পর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফায়সালভাই একটা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, নাও, রাকিবের চিঠি।

চিঠি না নিয়েই বললাম, আপনার বন্ধুকে বলবেন তাকে আমি ভুলে গেছি। তার কোনো চিঠি এখন আর আমার প্রয়োজন নেই।

ফায়সালভাই বললেন, মলি, তোমাকে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, তুমি চিঠিটা পড়, তার পরে যা বলার বলবে।

ফায়সালভাইয়ের অনুরোধটা আমার কাছে কেমন যেন মনে হলো। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। চিঠি নিয়ে পড়লাম।

মলি,

পারো যদি ক্ষমা করে দিও। আর কোনোদিন তোমাকে কষ্ট দেয়ার মতো কোনো কথা বলবো না। বহমান জীবনের গতিময়তায় এতোটুকুই দাবি তোমার কাছে, ভুলে যেও না। প্রিয়, ভুলে যেও না চিরতরে। বিদায়, চিরবিদায়।

রাকিব।

চিঠি পড়ে ফায়সালভাইয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ফায়সালভাই বললেন, রাকিবের ব্লাড ক্যান্সার হয়েছিল। সে আর বেচে নেই। আমি হতবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। ফায়সালভাইকে বসতেও বললাম না। এক সময় ফায়সালভাই চলে গেলেন।

আমার বিয়ে হয়েছে কয়েক বছর আগে। এখন আমি তিন সন্তানের জননী। কোনো কিছুই অভাব বোধ করি না। তারপরও মনে হয় কি যেন নেই। হ্যা, শুধু নেই রাকিব। একাকী সময়গুলো আমাকে বড়ই কষ্ট দেয়। না পাওয়ার কষ্ট। সত্যি রাকিব, বহমান জীবনের গতিময়তায় তোমাকে ভোলা সম্ভব নয়। কোনোদিনও নয়। তোমাকে যে ভুলতে পারছি না।

ঢাকা থেকে

মেরিনার

২৮ ডিসেম্বর সাইন-অন হয়েছে। পেনাং গিয়ে শিপে যোগ দেবো। ৩১ ডিসেম্বর চিটাগাং থেকে ঢাকা রওনা দেয়ার কথা। এজেন্টকে বললাম, একদিন আগেই ঢাকায় চলে যাই। এজেন্ট রাজি হলো। কাগজপত্র নিয়ে ৩০ ডিসেম্বর বাসে উঠে বসলাম।

একদিন আগে ঢাকা রওনা হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রভাতীর সঙ্গে দেখা করা। প্রভাতীকে জানালাম না। ঢাকার কাছাকাছি গিয়ে তাকে কল করলাম। বললাম, ঢাকায় আসছি।

খুব খুশি হলো। বললাম, তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে?

দেখা করার জন্য রাজি হলো না। কয়েকবার রিকোয়েস্ট করার পরও যখন রাজি হলো না তখন সত্যি খুব কষ্ট পেলাম। মনে হলো বৃথাই এতো কষ্ট করে ঢাকায় এলাম।

প্রভাতীর সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। অথচ আমাদের পরিচয় অনেক দিনের, মোবাইলের কল্যাণে। আমি যেমন ঢাকায় আসার সময় পাইনি, সেও তেমনি চিটাগাং কখনো আসেনি। এবার যা একটা সুন্দর চান্স পেলাম, মেয়েটার না বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই চান্স মিস হয়ে গেল।

লিটনের রুমে উঠলাম। রাতে মোস্তাফিজ, মাসুদসহ অনেকক্ষণ কার্ড খেললাম। রাতে বাইরে খেয়ে এলাম। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতেই আড্ডা জমে উঠলো। সবাই মাস্টার্স কমপ্লিট করার পথে। আমিই ওদের মাঝে পিছিয়ে আছি একজন মেরিনার হয়ে।

রাত এগারোটার দিকে চার্জ দেয়ার জন্য মোবাইল অফ করে রেখেছিলাম। একটার সময় অন করার সঙ্গে সঙ্গে এসএমএস পেলাম। প্রভাতীর এসএমএস দেখে তার কথা মনে পড়লো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার কল এলো। ফোন ধরার পর ওপাশ থেকে যা বললো তা হলো, এতোক্ষণ মোবাইল অফ কেন? সেই বারোটা থেকে ট্রাই করে যাচ্ছি। আমি কোথায় এখন।

ওকে একটু জড়িয়ে ধরতে। তারপর আমার বুকে মাথা রেখে তখন বললো, কাল সকাল নয়টায় সংসদ ভবনের সামনে দেখা করবে।

তার ওপরে প্রথমে রাগ থাকলেও মার্ফ করে দিলাম। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত চারটা। সকাল সাড়ে সাতটায় এলার্ম দিয়ে ঘুমালাম। সাড়ে সাতটায় উঠে দেখলাম বন্ধুরা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাতে মোস্তাফিজ ও লিটন বলেছিল, আমার সঙ্গে যাবে। প্রথমে রাজি হলেও পরে ভাবলাম প্রথম দেখায় একা যাওয়াই ভালো। কারণ অপমান হলেও কেউ সাক্ষী থাকবে না। এ কথা বলাতে তারাও রাজি হলো।

ফ্রেশ হয়ে রাস্তায় নামলাম আটটায়। একটা সিএনজি ডাকলাম। পাত্তা না দিয়ে চলে গেল। অন্য একটাকে ডাকলাম, দেখলাম আমার সামনে দিয়ে স্লো করে আমার পাশে দাড়ানো সুন্দরী যুবতীকে বললো, কই যাইবেন আপা?

নিজের চেহারাটা আয়নাতে দেখতে ইচ্ছা হলো। সমুদ্রে থাকতে থাকতে মনে হয় অন্যরকম হয়ে গেছে। মেজাজ খারাপ হতে শুরু করলো। সামান্য সিএনজি-ও পাত্তা দিচ্ছে না। ভাগ্য ভালো, চার নাশ্বারটাতে

উঠে পড়লাম। শীত লাগছিল। ফার্মগেট নামলাম। ভাবলাম আগে গিয়ে অপেক্ষা করার চেয়ে পরে গিয়ে বকা খাওয়া অনেক ভালো। তাছাড়া নাশতা খাওয়ারও ইচ্ছা হলো।

কল করে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় তুমি?

বললো শাহবাগ।

ঝটপট হোটলে ঢুকে নাশতা খেতে বসলাম। খাওয়ার মাঝামাঝি কল এলো। সে পৌছে গেছে। উঠে গিয়ে তেজগাও কলেজের সামনে থেকে একটা রিকশা নিলাম। সংসদ ভবনের সামনে গিয়ে তাকে দেখলাম। সবুজ মাঠের মাঝে শাদা পায়রা যেন পায়চারি করছে। কুয়াশা ঘেরা সকালে শাদা ড্রেসে চমৎকার সুন্দর লাগছিল।

রিকশায় বসে তাকে দেখলাম পূর্ব-পশ্চিমে পায়চারি করতে। রিকশা থেকে নেমে দাড়ানোর পর দেখলাম, সে বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। ভাবলাম ডজ খেলাম না তো। মোবাইলে কল করলাম। রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ ধরে না। ভাগ্য ভালো বলতেই হয়, সঙ্গে বন্ধুরা কেউ নেই। না হলে তাদের সামনে এখন উল্লুক হওয়া ছাড়া কোনো গতি ছিল না। যদিও নিজেকে উল্লুক মনে হচ্ছে।

ভাবতে অবাক লাগে, যে মেয়ে আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে, সেই মেয়ে আমার সামনে থেকে এভাবে চলে যাবে? ফিরে চলে আসবো ঠিক এই সময় দেখলাম সে আবার আমার দিকে ফিরলো। মাথাটা নিচু করে হাটি হাটি পা পা করে আমার দিকে আসছে।

আবারও মোবাইলে কল করলাম। কিন্তু কেউ রিসিভ করলো না।

সে ধীরে ধীরে আমার থেকে বিশ হাত দূরে থেমে গেল। পাশ দিয়ে একজন ছোট চা বিক্রেতা যাচ্ছিল। তাকেই পাঠালাম প্রভাতীর কাছে। কিছুক্ষণ পর প্রভাতী কাছে এলো। সালাম দিলাম। তাকে দেখে হাসি পাচ্ছে। লজ্জা নাকি ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। পাগুলো কাপছে। মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে মাথা নেড়ে উত্তর দিচ্ছে। সে যে এতো নার্ভাস হয়ে যাবে ভাবিনি।

কিছুক্ষণ হাটলাম। তারপর বললাম, চলো বোটানিকাল গার্ডেনে যাই। এতে সে মাথা নেড়ে সাই দিল। আবারও সেই সিএনজিতে করে বোটানিকাল গার্ডেনে গেলাম। এবার সিএনজি প্রথমবারই পেলাম। বোটানিকাল গার্ডেনে এক সময় তার হাত ধরলাম।

আস্তে আস্তে সে স্বাভাবিক হলো। দুই একটা কথা মুখ দিয়ে বের হতে লাগলো। এক স্থানে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে তার কোলে মাথা রাখলাম। যাওয়ার সময় সিএনজিতে দুইজন দুই মাথা থাকলেও ফিরে আসার সময় তার মাথা ছিল আমার কাধে। এলিফ্যান্ট রোডে এসে দুইজন খাবার দোকানে ঢুকলাম। সে অবশ্য কিছুই খেলো না।

শাহবাগের মোড়ে এলাম। বড় একটি ফুল কিনলাম। এক বছর তার সঙ্গে দেখা হবে না। তাই তাকে ছাড়তে ইচ্ছা হলো না। তাকে নিয়ে বসুন্ধরা সিটিতে গেলাম। সিনেমা দেখলাম। অন্ধকারে তার লম্বা চুলগুলো এলোমেলো করে দিলাম। তার চোখে আদর দিলাম।

সাতটায় বাসায় পৌছে দিলাম। যাওয়ার আগে সে আমাকে ছোট্ট একটা আদর দিয়ে নেমে গেল। যদিও আজ আমাদের প্রথম দেখা কিন্তু তার সঙ্গে কথা হয় বহু আগে থেকে। এর মাঝে মোবাইলে ৪ নভেম্বর নিজেরা বিয়ে করে ফেলেছি। তাই প্রথম দেখা করার দিন তাকে মোটেই অপরিচিত মনে হয়নি।

আমার জীবনে সত্যিই সেদিন ছিল আনন্দের দিন। প্রতি মুহূর্ত কেটেছে এক ধরনের আনন্দের মাঝে। পরদিন চলে এলাম অনেক দূরে। আজ গহীন সমুদ্রের মাঝে প্রিয়ার মুখ খুঁজে ফিরি। নীল সমুদ্রের মাঝে বুড়িকে খুঁজে পাই। পূর্ণিমার রাতে চাদের দিকে তাকালে তাকে দেখতে পাই।

এরপর এখনো তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু মাঝে মধ্যে কথা হয়। চিঠি লেনদেন হয়। আমাকে দেখতে চায়। কিন্তু সময় সুযোগ কিছুই মিলাতে পারছি না। কয়েক দিন পর সাইন অফ, ঢাকায় যাবো। তখন আবার দেখা হবে তার সঙ্গে।

বৌ, আই লাভ ইউ সো মাচ।

তোমার বন্ধুকে তুমি যেমন ভালোবাসো, তেমনি তোমার বন্ধুও তোমাকে খুব ভালোবাসে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
একজন থার্ড অফিসার, সমুদ্র থেকে

বরণ

লক্ষ্মী

১৯৮৬ সাল। আমার ছোট দুটি ছেলে। বয়স দুই আর চার। সেই সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমরা তখন চাকরিস্থল সাতারে বসবাস করি। অসুস্থতার কারণে বাচ্চা দুটো ওদের বাবার কাছে রেখে একাই ঢাকায় আসি, আপার বাসায় কমলাপুরে। আপা আমাকে বেইলি রোডে সুলতানা বেগমের পলি ক্লিনিকে নিয়ে গেল। সেখানে আমি পরামর্শের জন্য গেলাম। ডাক্তার আমাকে কিছু টেস্ট করাতে দিলেন। তাই ঢাকায় আমাকে থেকে যেতে হলো।

ছোট দুটি শিশু রেখে এসেছি বাসায়। আমার শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক কষ্ট হচ্ছে বেশি। আমি সন্তানদের রেখে আলাদাভাবে এক রাতও থাকিনি কোথাও। তখনই প্রথম উপলব্ধি করলাম নাড়ি ছেড়া ধন কাকে বলে। সারা রাত হটফট করে আর চোখের পানি ফেলে কাটলাম। পরদিন আমার স্বামী একা এলো। কারণ রিপোর্টগুলো নিয়ে আবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। যথাসময়ে রিপোর্টগুলো নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম।

ডাক্তার রিপোর্টগুলো দেখে বললো, ইউটেরাসে টিউমার, এখনই ক্লিনিকে ভর্তি করাতে হবে।

আমাদের সঙ্গে আপাও ছিলেন। আমার স্বামী মানিক আর আপা মিলে আমাকে তখনই ক্লিনিকে ভর্তি করে গেলেন। সন্তান দুটোর জন্য কাদছি দেখে মানিক আমাকে বললো, সচি এবং কচিকে নিয়ে কালকে আসবো। মানিক, আপা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমি একা সিক বেডে। নার্সরা অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরদিনই আমার অপারেশন হবে। মানিক সকালেই সচি, কচিকে নিয়ে চলে আসবে আমার কাছে। কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে আমার আরো একটি রাত শেষ হলো। অপারেশনের আগেই সবাই চলে আসবে। মানিক, সচি, কচি ও আপা। কিন্তু ভোর হওয়ার সঙ্গেই ডাক্তার এসে হাজির এবং নার্সদের বললো, এখনই পেশেন্টকে ওটিতে ঢোকাও।

আমি তো হতবাক। তখনো কেউ আসেনি আমার কাছে। নির্দিষ্ট সময়ের তিন চার ঘণ্টা আগেই আমাকে ওটিতে ঢুকিয়ে ফেললো।

সবাই বলাবলি করতে লাগলো, একটা পাগলা ডাক্তার। যখন যা মনে করে তখন তাই করে। এভাবে গার্ডিয়ান ছাড়া কেউ রোগী ওটিতে ঢোকায়?

আমার খুব রাগ হলো।

অপারেশনের পর যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখলাম মানিক, সচি, কচি, আপা, আমার বড়ভাই আমার পাশে দাড়িয়ে। আমার দুই চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সচি আমার চোখের পানি মুছে দিচ্ছে। তাই দেখে কচিও তার ছোট হাত দিয়ে মুছে দিচ্ছে এবং আমাকে আদর করছে। তারাও মাকে ছাড়া শুকিয়ে গেছে এবং মুখটা একেবারেই মলিন দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ থেকে সবাই চলে গেল।

আমি আবারও সন্তান ছাড়া একাকী সিক বেডে সময় কাটাচ্ছি। সিক বেডে শুয়ে জানতে পারলাম, এই পাগলা ডাক্তার নিঃসন্তান। একটি ছেলে দত্তক নিয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং সেবা দিয়েছেন। এই খবরটা শোনার পর তার প্রতি রাগ আমার শেষ হয়ে গেল। শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল।

ক্লিনিক থেকে বের হয়ে শারীরিক অবস্থা খুব দুর্বল বলে আপা তার বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাকে মায়ের আদর যত্ন দিয়ে সম্পূর্ণ ওষুধপত্র শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেখে দিলেন। মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পর সাভারে আমার সন্তানদের কাছে ফিরে গেলাম। সন্তানদের কাছে পেয়ে আমি দ্রুত ভালো হয়ে গেলাম। দেখতে দেখতে ঈদ এসে গেল। সবাই শ্বশুরবাড়ি গেলাম ঈদ উদযাপন করতে। সেই সময় রাস্তাঘাট খারাপ ছিল বলে যাতায়াতে একেবারে নাজেহাল অবস্থা হতো। বিশেষ করে গোলরা থেকে কান্দাপাড়া (সোটুরিয়া, মানিকগঞ্জ) পর্যন্ত যেতে।

বাড়ি যাওয়ার পর ফ্রেশ হওয়ার জন্য গোসল করতে ঢুকি ইন্দারার পাশে বাশের তৈরি গোসলখানায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার শাশুড়ি আম্মা একটি কাসার জগ হাতে করে এলেন। বললেন, একটু সোজা হয়ে বসো বৌ। বসার পর আমার মাথার ওপর এক জগ দুধ ঢেলে দিলেন। কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে গেলাম।

এমন সময় শাশুড়ি আম্মা বললেন, তাড়াতাড়ি গোসল সেরে চলে আসো। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

গোসল সেরে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি জন্য করেছেন?

বার বার প্রশ্নটা করার পর আম্মা উত্তর দিলেন, তোমার অপারেশনের খবর শুনে, তোমার বাচ্চাদের দেখতে গিয়েছি। মা ছাড়া শিশু দুটি দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, অপারেশনের পর বৌ যদি সুস্থ হয়ে তার সন্তানদের কাছে ফিরে আসে, ফিরে আসে আবার শ্বশুরের ভিটেয় তবে তাকে দুধ দিয়ে গোসল করিয়ে ঘরে তুলবো।

এর আগে কখনো এ ধরনের ঘটনার কথা শুনিনি, দেখিওনি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। শ্রদ্ধায় আমার মাথা অবনত হয়ে রইলো। আমার বিয়ের পচিশ বছর চলছে, এখনো আমার সেই দিনের শাশুড়ির দুধ দিয়ে বরণ করার কথা একটুও ভুলিনি। আমার কাছে এখনো এটা একটা আশ্চর্য রকমের ভালোবাসা, ভালো লাগা মনে হয় যা কারো সঙ্গে তুলনা করা যায় না এবং কাউকে আমার অনুভূতি বোঝানোও সম্ভব নয়।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

এরিয়েল

তৌফিক

ইংল্যান্ডে আসার পর দেশের কথা খুব মনে পড়ছিল। লন্ডন শহরের সব কিছু এখনো ভালোভাবে চিনি না। আমি যে বাড়িতে থাকি তার পাশে সুন্দর একটা পার্ক আছে। মাঝে মধ্যে সেখানে যাই।

সানডে, সকাল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে।

আজ বাসা থেকে বের হবার কোনো ইচ্ছা নেই। বিকেলে ফোনবুথ থেকে দেশে ফোন করে কথা বললাম সবার সঙ্গে। আসার পথে একটা চিপসের প্যাকেট নিয়ে পার্কের ভেতর হাটতে লাগলাম। একটা বেঞ্চে বসে সদ্য কেনা এমপিথ্ প্লেয়ারটা অন করে Robart Mills-এর মিউজিকে নিজেই ভাসিয়ে দিলাম। কিছু সময় পরে দেখলাম একজন মহিলা সানগ্লাস চোখে দেয়া এক তরুণীর হাত ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসার পর মেয়েটিকে দেখলাম। বয়স ১৭-১৮ বছর হবে। হায় খোদা! মানুষ এতো সুন্দর হয়! তার কোমর পর্যন্ত সোনালি চুল, গোলাপি ঠোঁট। সানগ্লাসের জন্য চোখ দেখা যাচ্ছিল না। তবে চোখ যে অনেক সুন্দর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহিলা বললেন, আমি ক্লারা আর আমার মেয়ে এরিয়েল। তুমি কি এখানে কিছুক্ষণ আছো? আমি এফনি আসছি।

তারপর যা বললো তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না – সে অন্ধ, একটু খেয়াল রেখো।

নির্বাক হয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই। এরিয়েল পাশে বসলো কিছুটা দূরত্ব রেখে। আমি এরিয়েল –ওই প্রথম তার কণ্ঠ শুনলাম। খুবই মিষ্টি কণ্ঠস্বর। সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিলাম। এরিয়েল জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি প্রতিদিন পার্কে আসো?

প্রতিদিন না হলেও মাঝে মাঝে আসি।

অনেকক্ষণ গল্প করার পর জানতে পারলাম ১২ বছর বয়সে একটা কার অ্যাকসিডেন্টে তার বাবা মারা যান আর সে অন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তাররা বলেছেন নতুন কর্নিয়া সংযোজন করলে সে আগের মতো দেখতে পাবে। সে একটা মিউজিক স্কুলে পড়ে এবং ভালো পিয়ানো বাজায়। কাছের মানুষ হচ্ছে বান্ধবী ট্রেসি।

আমি তো তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

এরিয়েলকে বললাম, তোমার বন্ধু হতে পারি?

সে একটু হাসলো। বললো, অবশ্যই। সে ফোন নাম্বার দিল, আমি ফোনবুকে লিখে রাখলাম। এরই মাঝে এরিয়েলের মা চলে এলেন।

মিসেস ক্লারা বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের এখন উঠতে হবে।

তারা গাড়িতে উঠে চলে গেল। আমিও বাসায় চলে এলাম। শুয়ে শুয়ে শুধু তার মুখটা মনে করতে লাগলাম। বুঝলাম গভীরভাবে তার প্রেমে পড়েছি।

একদিন বিকেলে ফোন করলাম। মিসেস ক্লারা ফোন ধরলেন। পরিচয় দেয়ার পর চিনতে পারলেন। তারপর এরিয়েলকে দিলেন। এরিয়েল আমার কণ্ঠ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো।

এতো দেরিতে ফোন করলে কেন? তোমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম। I miss you so much, but I don't know why. তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। আগে কখনো এমন হয়নি।

আমিও তোমাকে খুব মিস করছি।

সেই থেকে শুরু আমাদের ফোন আলাপ। প্রতিদিনই কথা বলতাম। কখন যে সে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে বুঝতে পারিনি।

একদিন ফোনে বললাম, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। কিভাবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

বললো, মা তো একা কোথাও যেতে দেবেন না। তবে ট্রেসিকে নিয়ে বের হতে পারবো। পরের দিন লোকেশন ঠিক হলো পার্কে ট্রেসি আর সে অপেক্ষা করবে বিকাল তিনটায়। এরই মধ্যে একটা কোর্স করতে আমাকে স্কটল্যান্ড যেতে হবে। প্রায় তিন মাস থাকতে হবে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, তাকে ছাড়া থাকতে হবে।

পরের দিন বিকাল তিনটায় কিছু ফুল ও তার প্রিয় চকোলেট নিয়ে পার্কে গেলাম। খুব একটা অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষণ পরই ট্রেসি আর সে এলো। তাকে যে কি সুন্দর লাগছে! আমি নির্বাক। শুধু অপলক চেয়ে আছি। তার হাত দুটি ধরে পাশে বসলাম। এরই মাঝে ট্রেসি আমাদের একা থাকার সুযোগ দেয়ার জন্য দূরে হাটতে গেল। আমার কাধে মাথা রেখে সে অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকলো।

তারপর বললো, আগামী মাসে আমার চোখ অপারেশন হবে। অপারেশন সাকসেসফুল হলে আবার দেখতে পাবো।

তার চোখে আলতো চুমু দিয়ে বললাম, ভয় পেও না। তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে আগের মতো। তার হাতটা আমার হাতে নিয়ে বললাম, আগামীকাল স্কটল্যান্ড যাচ্ছি তিন মাসের জন্য।

সে চুপচাপ মাথা নিচু করে আছে। দুহাতে তার মুখ আমার দিকে ফেরালাম। দেখি কাদছে।

বললো, তোমার সঙ্গে কি আর দেখা হবে?

তার চোটে গভীরভাবে চুমু দিয়ে বললাম, এই তো কয়টা দিন।

এরই মাঝে ট্রেসি এসে বললো, ফিরতে হবে এখনই। সে আমাকে জড়িয়ে ধরেই আছে। তারপর বললো যেন প্রতিদিন ফোন করি।

সে আর ট্রেসি চলে গেল। মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

পরের দিন ট্রেনে স্কটল্যান্ড রওনা হলাম। নতুন জায়গা তবে খুব সুন্দর পাহাড়ি এলাকা। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। এরই মাঝে অনেক বার এরিয়েলের বাসায় ফোন করেছি। এরিয়েলের মা জানিয়ে দিলেন যেন এরিয়েলের কাছে আর ফোন না করি। বুঝতে পারলাম এরিয়েলের মা আমাকে মোটেও পছন্দ করছেন না।

তারপর অনেক চিন্তা করে এরিয়েলের স্কুলের ঠিকানায় চিঠি লিখলাম। দুই মাস কেটে গেল, কোন উত্তর এলো না। আমিও সব কিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু আরো বেশি করে মনে পড়ছে।

তিন মাস কেটে গেছে, আমার লন্ডন ফেরার সময় হয়ে এলো। সেদিন ছিল সোমবার। সকাল নয়টায় ঘুম ভাঙলো ডোর বেলের শব্দে। কি হোল দিয়ে দেখলাম এরিয়েলের মতো দেখতে একটি মেয়ে। দরজা খুলতেই দেখলাম এরিয়েল আর ট্রেসি। ট্রেসি হাসছে।

এরিয়েল আমার নাম জানতে চাইলো।

আমি বললাম না। সোজা আমার বুকে এসে মুখ লুকিয়ে বললো, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

এরিয়েলের চোখে-মুখে আনন্দ। দুহাতে তার মুখটি তুলে আমার দিকে ফেরালাম।

সে বললো, তুমি কি আমার চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না? তার দুচোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

বললাম, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, তুমি শুধু আমার জন্য তৈরি হয়েছো। I love you so much. তার ঠোটে গভীরভাবে চুমু খেলাম। সেদিন রাতের ট্রেনেই লন্ডনের উদ্দেশে আমি, এরিয়েল, ট্রেসি স্কটল্যান্ড ত্যাগ করলাম। ট্রেন দ্রুত লন্ডনের উদ্দেশে চলতে লাগলো।

এরিয়েল আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। Viva forever this time.

চট্টগ্রাম থেকে

ripon911@yahoo.co.uk

রোবট

সুমী

স্বামীকে ভালোবাসি আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, আমার বক্ষ বন্ধনীর মতো, অমাবস্যার আধারে আলোর মতো, কনফিডেন্স লবণের মতো। এতো ভালোবাসলে কি হবে, সে অনড় জড় পদার্থের মতো। আমার ভালোবাসা একতরফা। এ একতরফা ভালোবাসা দিয়েই আমার রাত কাটে, দিন কাটে।

আমি ডায়নামিক। বেশি কষ্ট পেলে গাইতে থাকি- আমার ঘরেও জ্বালা, বাইরেও জ্বালা ঘরেও... জ্বালা রাইতে দিনে, একমাত্র তোর প্রেমের কারণে অথবা আমার গায়ে যতো দুঃখ সয়, বজ্রঝারে দিও তোমার মনে যাহা লয়।

এতো কিছু পরও রোবটকে নিয়েই আমার ধ্যান, জ্ঞান। রোবট ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। রোবট স্বমেহনে অভ্যস্ত। মাস যায় বছর যায় রোবটের স্ত্রী সহবাসে আগ্রহ নেই। মাঝে মাঝে ভাবি ইমাপাটেন্ট হয়ে পড়লো নাকি। না, সে ভুল ভাঙলো যখন রোবট লৌহদণ্ডের ন্যায় অঙ্গটি একটানা দুই ঘণ্টারও বেশি সময় সচল রাখতে পারলো। আমার রোবট-এর বয়স পঞ্চাশ। দোয়া করবেন রোবট যেন রক্ত মাংসের ও বৃহৎ হৃদয়ের অধিকারী হয়। সেক্স-এর জন্য নয়, এমনিতেই ধরা ছোয়ার মাঝে যেন পাই। যেমন খুব বৃষ্টির মাঝে রিকশায় খুব কাছে ঘেষে আধা ভেজা হয়ে বা শৈত্য প্রবাহের সময় কবলের নিচে নিজ থেকে ডেকে নিয়ে যায়।

হবিগঞ্জ থেকে

পছন্দ অপছন্দ

রুমকী আখন্দ

ফারহানকে ভালোবাসি। খুব, খুব এবং খু-উ-ব ভালোবাসি। সে আমাকে খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখায়। সে যখন আমার সঙ্গে কথা বলে তখন খুব ভালো লাগে। তবে সে এমন কোনো স্বপ্ন দেখায় না যা অসম্ভব। সে বাস্তব নিয়ে সুন্দর কথা বলে।

আমার প্রায় সব বান্ধবীদের একজন করে প্রেমিক আছে। একজনের তো তিনটি ছেলের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক, যা অবিশ্বাস্য।

ফারহানের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার আগে বান্ধবীরা প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার সময় (অপেক্ষা করার সময়টুকু কাটানোর জন্য) আমাকে ডাকতো, আমি যেতাম। প্রথম কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকতাম। তখন দেখতাম প্রেমিক অতি আবেগে কি রকম করে কথা বলছে। প্রেমিকাকে প্রেমিক বলতো, ঘর থেকে এ সম্পর্ক মেনে না নিলে প্রয়োজন হলে রিকশা চালিয়ে সংসার চালিয়ে প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর বাধবে। যেহেতু কচিখুকি ছিলাম না তাই এসব রোমান্টিক ডায়ালগ শুনে হাসি পেতো। রিকশা চালিয়ে সারা দিন পরিশ্রম করে ঘরে এসে ঠিকমতো খাবার না পেলে প্রেমিকা (স্ত্রী)-র হাসি মুখ দেখেও ভালো লাগবে না।

ফারহানের দৃঢ় বিশ্বাস সে আমাকে ঘরে তুলে নিতে পারবে।

ফারহানকে খুব বেশি ভালোবাসি। তাই সে যা পছন্দ করে, আমিও তা পছন্দ করি। সে যা অপছন্দ করে, আমিও তা অপছন্দ করি। আমাকে এ প্রসঙ্গে ফারহান বলেছে, তোমার নিজস্ব কিছু পছন্দ-অপছন্দ আছে যা আমার জন্য তোমার ছাড়া উচিত নয়।

এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। ফারহান বেশি মেকআপ করা পছন্দ করে না এবং আগুন রঙা লিপস্টিকও পছন্দ করে না। তার কথা হলো, যেহেতু মুখ-টুখ ধুয়ে ভালোবাসার মানুষের কাছে যেতে হবে, তাই ভালোবাসার মানুষটিকে মেকআপ ছাড়া মুখটা দেখে অভ্যাস করানো উচিত। না হলে ভালোবাসার মানুষটি শেষ দিকে ধাক্কা খাবে।

ফারহান তার সব কিছু আমাকে বলে। বলেছে, সে যখন ক্লাস ফোর ফাইভে পড়তো, শুক্রবারে মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যেতো। জামাতে জুমার নামাজ আদায় করার সময় সে নাকি নামাজের নিয়ত বলে একত্রে দায়েতু বিহাজাল ইমাম বলে তার স্বপ্নের জগতে চলে যেতো। তার কথা হলো, যেহেতু সে একত্রে দায়েতু বিহাজাল ইমাম বলেছে, তাই এ নামাজে সুরাসহ সব কিছু পড়ার দায়িত্ব ইমামের। সে নিয়ত বেধে স্বপ্নের জগতে চলে যেতো। ভাবতো, বিকেলে ক্কেট মাঠে সে বলটা কি রকম টার্ন করাবে। যেহেতু সে অফস্পিন করতো, তাই স্পিন বল নিয়ে ভাবতো। অবশ্য মাঠে তার বোলিংয়ে বড়রা মজা পেতো। বিশেষ করে বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানরা।

ফারহান ক্লাস টেনে ওঠার পর ঠিক করলো, এখন থেকে তার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যারা মারা যাবেন তাদের লাশ সে কবরে শোয়াবে অর্থাৎ মুসলমান একজন মানুষ মারা গেলে তিনজন ব্যক্তি কবরে নেমে সে লাশকে কবরের ভেতরে শুইয়ে রাখে। সে তিনজনকে লম্বা ও শক্ত সামর্থ্য হতে হয়। অবশ্য মহিলা কেউ মারা গেলে অনাত্মীয় কেউ যে লাশ কবরে নামানোর সুযোগ পায় না। সে ঠিক করেছে, মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত একশটি লাশকে পরম যত্নে কবরে শুইয়ে রাখবে। এই পাচ বছরে মাত্র সতেরোটি লাশকে শোয়াতে পেরেছে। এর বেশি পারেনি। কারণ লাশের আত্মীয়স্বজনরা চায় তারাই লাশকে পরম মমতায় কবরে নামাবে। আমার গোপন একটি ইচ্ছা হলো, আমার লাশটি ফারহান শেষবারের মতো কবরে রাখবে এবং আমার লাশ দিয়েই সে কবরে একশটি লাশ শোয়ানোর স্বপ্ন পূরণ করবে।

ফারহান আমাকে বলেছে, আমি যেন প্রস্তুত থাকি। সে ঠিক থাকবে। তার আত্মা বা তার বোন জেসমিন যদি আমাকে মেনে না নেন তাহলে আমি যেন তার আত্মা ও জেসমিন আপাকে বলি, আমার পেটে ফারহানের বাচ্চা রয়েছে। এ কথার পর তার আত্মা বা বোন নিশ্চয়ই আমাকে মেনে নেবেন।

ফারহানের যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দের তা হলো, আমি যখন তার সঙ্গে হাটি তখন সে বরাবরের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাটে। দ্রুত গতিতে হাটে। একটা মেয়ে যে একটা ছেলের মতো দ্রুত গতিতে হাটে পারে না, তাহলে আশপাশের সবাই হা করে তাকায়। তখন ফারহানকে নিচুকণ্ঠে বলি, ধীরে যাও।

তার এই বদঅভ্যাসটা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। আশা করছি, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে এ বদঅভ্যাসটা ছাড়তে পারবে। ফারহান, আই লাভ ইউ।

মৌলভীবাজার থেকে

রোমান্টিক

আমার জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল যখন এক সঙ্গে দুজন যুবক আমাকে ভালোবাসতো। অবশ্য এ ভালোবাসাটা ছিল একপাক্ষিক অর্থাৎ আমার দিক থেকে তেমন একটা সমর্থন ছিল না। তাই বিষয়টা দূর থেকে এনজয় করতাম। ওই দুই যুবক ছিল আবার একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এমনকি তারা একই রুমে থাকতো। দুজনের নামের শুরুটা অবশ্য স/S দিয়ে। পেশায় একজন ছিল প্রকৌশলী, অন্যজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার। আশ্চর্যের বিষয় ছিল প্রকৌশলী জানতো না ঠিকাদার আমাকে পছন্দ করে। আবার ঠিকাদারও জানতো না প্রকৌশলী আমাকে পছন্দ করে। তারা দুজন যখন এক সঙ্গে ঘুরতে বের হতো তখন দুজনই এতোটাই সতর্ক থাকতো যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে তাদের পছন্দের কথা।

তাই মাঝে মাঝে হয়তো বা প্রকৌশলী বলতো, চলো আমরা রাস্তা দিয়ে হাটাহাটি করি।

রাস্তা দিয়ে হাটাহাটি করা মানে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা।

তখন ঠিকাদার বলতো, না, আজকে বাজারের দিকে যাওয়া যাক অর্থাৎ তার মনে একটা গোপন ঈর্ষা বোধ কাজ করতো যদি হাটাহাটি করলে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আবার যদি কখনো ঠিকাদার অনুরূপ প্রস্তাব করতো তাহলে প্রকৌশলী তা কৌশলে এড়িয়ে যেতো।

বিষয়টা তাদের এক ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে জেনেছিলাম তারা চলে যাবার পর। তবে তাদের কেউ যখন একা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতো তখন বার বার বাড়ির দিকে তাকাতো, কারণ আমাকে যদি দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে কখনো আবার পেয়েও যেতো। তখন আমার দিকে তাকাতো আর মিটমিট করে হাসতো। অনেক সময় ইশারায় কথাও বলতো। সে সময় খুবই রোমান্টিকতা উপলব্ধি করতাম। মাঝে মধ্যে রাস্তায় দেখা হলে কুশল বিনিময় করতো। তাদের কথা ছিল ছোট এবং তারা ছিল খুবই মিষ্টভাষী। কথা-বার্তা, চাল-চলন এবং পোশাক-আশাকে তারা ছিল যথেষ্ট পরিপাটি এবং মার্জিত। তাদের শালীনতা বোধ ছিল প্রখর। আমি যখন যাচাই-বাছাই করছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে তারা বদলি হয়ে দূরে চলে গেল। অবশ্য যাবার আগে তারা ঠিকানা দিয়েছিল যোগাযোগ করার জন্য। সাহস পাইনি যোগাযোগ করতে, যদি কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় এই ভেবে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

জীবন থেকে নেয়া

আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। বাড়ি এক ছোট জেলা শহরে। বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মা গৃহিণী। যে লেখাটি লিখছি তা আমার জীবন থেকে নেয়া।

বাবা ব্যবসায়িক কাজে বেশির ভাগ সময়ই বাসার বাইরে থাকেন আর মা সপ্তাহে প্রায় ছয় দিন অসুস্থ থাকেন। প্রতিদিন তিন বেলা মিলে যে পরিমাণ ওষুধ তিনি সেবন করেন তা দাড়িপাল্লায় ওজন করলে ২৫০ গ্রামের বেশি হবে, কম নয়।

বাসার এ পরিস্থিতি দেখে আমার মামাতো ভাইয়া এলেন আমাদের বাসায়। একজন অভিভাবকের যা করণীয় তিনি আমাদের জন্য তাই করতে শুরু করলেন। মায়ের উন্নত চিকিৎসা, ছোট ভাইকে স্কুলে নিয়ে

যাওয়া, নিয়ে আসা এবং পড়ালেখার প্রতিও তার ১০০% নজরদারি। তার প্রেরণায় ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেলাম। এসএসসি, এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করলাম এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম।

যখন ক্লাস এইটে উঠেছি সে সময় থেকে ভাইয়া আমার পড়ার প্রতি যথেষ্ট নজরদারি শুরু করলেন। এদিকে বাসায় ল্যান্ড ফোন এবং মোবাইল ফোন থাকায় নামে বেনামে নানান কল আসা শুরু করেছে প্রতিদিন। মা অসুস্থ থাকায় আমাকে প্রায়ই সেগুলো রিসিভ করতে হতো। বেশির ভাগই কল আসতো প্রেমের প্রস্তাব। ফলে মনে হতো আমি বেশ সুন্দরী।

সব ঘটনা ভাইয়াকে খুলে বললাম। ভাইয়া শুনে আমাকে একটা কথা সব সময় বোঝানোর চেষ্টা করতেন, তা হলো- ভালো রেজাল্ট করলে ভালো ছেলের অভাব হয় না। তাছাড়া যারা এসব প্রেমের প্রস্তাব দেয় তারা সবাই অল্প বয়সের, বেকার। তারা কি বিয়ে করতে পারবে? ভাইয়ার একটা কথা সবচেয়ে বেশি পছন্দ হতো, তা হলো- উপযুক্ত বয়স হলে তো বাবা-মা উপযুক্ত পাত্রের হাতেই দেবেন। অযথা প্রেম করে, নিজের এবং বাবা-মায়ের মান-সম্মান নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। ভাইয়ার আরো যুক্তি হলো- প্রেম করতে গেলে দুদিন আগে বা পরে দু চারজন জানাজানি হবেই এবং তা দেখে পাড়া প্রতিবেশীরা বেশি খুশি হন।

ভাইয়ার এ উক্তিটা আমার এক প্রিয় বান্ধবীর বড় বোনের জীবনে ১০০% মিলে গিয়েছিল এবং সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে যতোদিন বাচবো কোনো দিন প্রেম করবো না।

এদিকে ভাইয়ার কথা, বৃত্তি পেতেই হবে। সে জন্য রাত দিন আমাকে সময় দিতে লাগলেন। তার মুখে পড়ালেখার গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প শোনা যেতো না। অনেক সময় এমন হতো যে, টেবিলে পড়ছি আর ভাইয়া খাটে হেলান দিয়ে পড়া দেখতে দেখতে আমার খাটেই ঘুমিয়ে যেতেন। আমিও ভাইয়ার ঘুম নষ্ট না করে সারা রাত পড়ালেখা করে ফজরের আজান ধ্বনি শুনতাম।

একদিন ভাইয়া খাটে ঘুমাচ্ছেন। রাত প্রায় দেড়টা হবে; আমার চোখ কিছুতেই বইয়ের পাতায় ধরে রাখতে পারছিলাম না। ভাইয়ার ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে ভাইয়াকেও ডাক দিতে চাইলাম না। আস্তে করে ভাইয়ার পাশে শুয়ে পড়লাম। ভাইয়া ঘুমে বিভোর থাকায় মোটেও টের পেলেন না। শোবার পর ঘুম যেন কোথায় হারিয়ে গেল আর মাথায় চাপলো এক বান্ধবীর কাছে শোনা কুবুদ্ধি। খুব সাবধানে আমার শরীরের সব কাপড় খুলে ভাইয়ার শরীরে যে কাথা ছিল তার ভেতর আস্তে করে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ পরে ভাইয়ার বুকে মাথা রাখলাম আর তাতেই ঘুম ভেঙে গেল, ওমনি তার ঠোটে গভীরভাবে চুমু খেললাম।

আমাকে সরিয়ে দিতে চাইলে তাকে অষ্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে বললাম, প্রতিদিন শুধু আপনার কথা শুনি আজ আমার সব কথা শুনবেন। আপনার কথামতো কোনো ছেলের দিকে আজ পর্যন্ত মাথা উচু করে তাকাই না আর প্রেম তো দূরের কথা। আজ সম্পূর্ণরূপে আপনার ভালোবাসা চাই। আমাকে এমন ভালোবাসা দেবেন যে, সেই ভালোবাসার কথা স্মরণ করে কোনো মুহূর্তে অন্যের দিকে নজর না যায়। আপনি সব কিছু দিয়েছেন আমাকে তবে কেন গভীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করবেন?

আমার যুক্তির কাছে তিনি পরাজিত হলেন। আমার শরীর চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলেন। অবশেষে সাগরে সাতার দিয়ে ক্লান্ত নাবিকের মতো তীরে উঠলেন। যে স্বাদ, তৃপ্তি, ভালোবাসা তিনি সেদিন দিয়েছিলেন তা সত্যিই ভোলার নয়।

ভাইয়া আজ বড় চাকরি পেয়েছেন। আমাদের পছন্দমতো বিয়ে করেছেন। ভাবীকে নিয়ে আমাদের শহরেই থাকেন। তবুও প্রয়োজনে ভাইয়াকে ডাকমাত্র হাজারো ঝড় তুফান উপেক্ষা করে আমার ঝড় থামিয়ে যান। সে জন্য অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে প্রেম করার প্রয়োজন হয় না। যার ফলে পরিবারের, সমাজের এবং বন্ধুদের চোখে আমার মতো ভালো মেয়েই হয় না! কোনো বাজে রিপোর্ট না থাকায় বাবা-মাও রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তা না হলে অনেক আগেই বিয়ে দিয়ে দিতেন।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

পাঠান ও পিউ

মোহাম্মদ জেডএ কামাল

এ বছরের রমজানে যখন শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন অফিস ডিমলিশনে পড়লো তখনই বসের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মাত্র বিশ দিনের মাথায় আমার বস টনি আরজানো নতুন অফিস নিয়েছিলেন স্টেডিয়াম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে।

শুরু হলো শিফটিং নামের যন্ত্রণা। বাড়ি বা অফিস যারা চেঞ্জ করে তাদের অবস্থা ভুক্তভোগীরাই ভালো জানেন। বিশেষ করে ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে যাদের অবস্থান। আমি তার শিকার হলাম সুদূর শারজাহর বুকো। কিন্তু e-moving (পেশাদার শিফটিং কম্পানি) কম্পানির বদৌলতে তেমন অসুবিধা হয়নি।

এবার আসছি আসল ভালোবাসার গল্পে। পাঠান ও পিউ-এর কথাই বলবো।

প্রথম যেদিন নতুন অফিসে এলাম সেদিনই আমাদের অফিস বিল্ডিংয়ের কেয়ারটেকার পাঠান খান আমাদের হৃদয় জয় করে ফেললেন। তার বয়স হবে চল্লিশ। পাঠানভাইয়ের ব্যবহার ও আন্তরিকতা সত্যিই অতুলনীয়।

এতোদিন পাকিস্তানিদের ঘৃণা করতাম ১৯৭১-এর যুদ্ধের জন্য। কিন্তু পাঠানভাই বললেন, পাঠানরা অনেক ভদ্র এবং মার্জিত। একাত্তরের যুদ্ধে বেশি অত্যাচার করেছে পাকিস্তানি পাঞ্জাবিরা।

নতুন অফিসে প্রথম দিনেই দুপুরে এলো একটি বিড়াল। পাঠান তাকে দেখে ফিশফিশ করছিলেন।

প্রথম দেখাতেই সে বিড়ালটির ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলাম- যাকে বলে নিখাদ ভালোবাসা!

সেদিনই ভাবলাম, এতো সুন্দর স্বাস্থ্যবান বিড়াল-এর একটা সুন্দর নাম হওয়া উচিত।

পাঠানকে বললাম, আজ থেকে এর নাম পিউ।

সেই থেকে দীর্ঘ তিন মাস হতে চললো, সবাই তাকে পিউ বলে ডাকে। আমরা যখন অফিস থেকে লাঞ্চ আওয়ারে আসি, বাসায় দেখি পিউ আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। পিউ শুধু ফ্রেশ মিল্ক, টিনজাত মাছ (টুনা) ও ফ্রেশ মাংস খায়।

পিউকে বাংলাদেশের ফ্রোজেন রুই মাছ ভাজা খাইয়ে পাগল করে দিয়েছি।

প্রতিদিন সকালে যখন পাঠানভাইকে দেখি, হাই, হ্যালো ও সালামের পর পিউয়ের কথাই বলি।

অফিসে আমরা আট দশ ঘণ্টা থাকি।

এই পিউয়ের ছবি আমার বান্ধবী ঝুমু ও ছোট বোন তুলির কাছে পাঠিয়েছি।

ইদানীং পাঠানভাইয়ের অন্য সাইটে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। পাঠান আমাদের সবার নাশ্বার নিয়েছেন যোগাযোগ রাখবেন বলে। তার শারজাহ এয়ারপোর্ট সাইটে যাবার কথা।

পাঠানভাই বলেন, আমার এখন অন্য সাইটে গিয়ে খারাপ লাগবে না। তোমাদের ভালোবাসায় পিউ ধন্য হবে, দীর্ঘ চার বছর পিউ আমার সঙ্গে আছে। তাকে ছেড়ে যেতে কিছুটা কষ্ট হবে। কিন্তু সান্ত্বনা, তোমরা তো আছো।

শারজাহ, ইউএই থেকে

kamalza@hotmail.com

সুচেতনা

এজেডএম আহসান হাবিব

তোমাকে ছুইনি হাতে, মুখোমুখি চোখে কোনোদিন,

আমার প্রকৃত প্রেম তবু যেন তোমাকেই ভালোবাসে।

(প্রথমবার প্রতি/নির্মলেন্দু গুণ)

তোমার একটি সুন্দর নাম আছে। ফুলের নামে নাম। তাই ফুলটি আমার খুব প্রিয়। এ লেখায় তোমাকে সুচেতনা বলে ডাকবো। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, নতুন নামে আগের মতো ডাকার কোনো অধিকার আমার জন্য রাখিনি বলে। তবুও নিজের অজান্তে, মনের অলক্ষ্যে সেই নামগুলো বার বার ফিরে আসে আমার কাছে। তুমি তো জানোই, আমি বরাবরই ভীতু। জীবনে কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারিনি। পারিনি বলে হয়তো পড়ালেখাটা কোনো এক প্রকারে শেষ করে সহজ সরল একটা চাকরিতে ঢুকে পড়েছি। রিস্ক নিতে জানি না। তাই আমার জগৎটাও ছোট। যদি একটু সাহস থাকতো অথবা তুমি যদি একটু সাহসী করে তুলতে আমাকে তাহলে সব কিছু আজ অন্যরকম হতো। সুচেতনা নাম দিয়ে এ চিঠি লিখতে হতো না।

এই দেখো না, এখনো কি রকম ভীতু আছি! তখন তুমি কেন বলতে বেশি সাহস ভালো না। সাহস নেই বলে তোমাকে কিছু বলার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারিনি। অথচ তোমার ওখানে কতোবার গেছি কি যেন একটা কথা বলবো বলে। কথার পিঠে কথা গেথে কতো কথা বলতাম। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সেই কথাটি বলা হয়নি। তখন তোমার হাতটুকুও ধরিনি, অতি সুকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী যেখানে উদ্বেল। মনে হতো ওই হাত একবার ছুতে পারলে সেই আনন্দে আমি সহস্র জীবন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারি।

আর এখন? তুমি জানো না, কি অসম্ভব স্পর্শ কামনায় জ্বলে যাচ্ছি আমি। সৈয়দ মুজতবা আলীর শবনমের সেই পাগমান পাহাড়ের বরফের মতো ধবধবে শাদা... বন মল্লিকার পাপড়ির মতো তোমার মিহিন চুলে জড়ানো কপালে ঠোট রাখতে ভীষণ ইচ্ছা করছে আমার। প্রচণ্ড বিরহে মরে যাচ্ছি। আচ্ছা, প্রেমের গভীরতম প্রকাশ তো বিরহেই? তবে আমি কি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম?

জানো সুচেতনা, মাঝে মধ্যে সারা রাত জেগে থাকি। রাতকে মনে হয় অনেক বড়, পৃথিবীকে মনে হয় নিঃসঙ্গ। ঘুম আসে না। ঝুল বারান্দায় বসে থাকি চুপচাপ। কেউ জানতে পারে না। শুধু ভোরের সূর্যটা দেখতে পায় একাকী এই আমাকে। চোখের সামনে জেগে ওঠে রাত ফুরানো রাঙা আকাশ। রবীন্দ্রনাথ এমন রঙের আকাশ বর্ণনা করতে গিয়েই বোধ হয় বলেছিলেন, *বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এলো পূর্ব গগন*। বিয়ের রঙ কেমন হয় জানো? তুমি তো জানবেই। কিন্তু আমার যে আজো সে লগ্ন এলো না। হয়তো জানাই হবে না। এক বুক আহ্বান নিয়ে বসে আছি। কবে তুমি আসবে। আমার তৃষ্ণার্ত চুমুতে রাঙা হয়ে উঠবে তুমি আর বিয়ের রঙ লাগবে চোখে-মুখে, আমার সমস্ত চেতনায়। আমি শাস্বত সত্তার গভীর থেকে তোমায় ডাকছি। এখনো তোমার জন্য -

চক্ষে আমার তৃষ্ণা

তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।

জানি, তুমি আসবে না। আসতে পারবে না। কিন্তু আমি যে তুমি ছাড়া আর কাউকে আহ্বান জানাতে পারছি না। গালিবের কথাই ঠিক -

এ তো নাই কি তুমি জাহায়ে হাসিন নাই

ইস দিলকা কেয়া করু কি বহলতা নেহি।

(তোমার চেয়ে সুন্দরী এ দুনিয়াতে আর কেউ নেই এমন তো নয়। কিন্তু করি কি? আমার হৃদয় যে অন্য কোথাও নড়তে চায় না।)

মেয়েরা নাকি জলের মতো। যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রেরই রূপ ধারণ করে। তাই তারা খুব সুখী। তুমি তো খুব সুখে আছো। আর আমাকে সহস্র বছরের জমানো কঠিন শিলার মতো এমন শক্ত করে গেছো, অন্য কোনো রূপ নিতে পারি না। আমার সব কিছু নিয়ে হারিয়ে গেছো অন্ধকারে, যেন তুমি এক দূরতম দ্বীপ। ভালোবাসা, তোমার দ্বিতীয় নাম যদি স্মৃতি হয় তবে সেই স্মৃতিকে আজীবন বয়ে বেড়াবো সোনার কৌটায় ভরে বুকের মধ্যে রেখে।

আচ্ছা সুচেতনা, আজ থেকে অনেক দিন পর, ধরি কুড়ি বছর পর তোমার সঙ্গে যদি আবার দেখা হয় তখন কি তুমি চিনতে পারবে? তুমি কি বলবে, *আমাদের যে দিন গেছে সে দিন কি একেবারেই গেছে?*

প্রতিটি রক্ত কণার গহীন গহ্বর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি, একদিন আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে কোনো এক ঝর্ণার ধারে।

ঘোড়াশাল, নরসিংদী থেকে

এক কথায় উত্তর

সৌরভ

বৃষ্টি আমার ফুফাত বোন। ক্লাস ফাইভে যখন সে পড়ে তখন থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। অবশ্য আমি ছিলাম তখন ক্লাস নাইনে। দিন যতো পার হয় ততোই যেন তার প্রতি আমার দুর্বলতা বেড়ে যায়। প্রকাশ্যে কখনো তাকে ভালোবাসার কথা বলিনি। তবে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ছোট চারাগাছের মধ্যে কাগজে আমি তোমাকে ভালোবাসি লিখে ঝুলিয়ে রাখতাম।

ব্যাপারটা অবশ্য তার ধারণার ভেতরে গেল। তার জন্মদিনে একটা করে গাছ লাগাতাম। অবশ্য তাদের বাড়ির সীমানায় লুকিয়ে গিয়ে। তার এক জন্মদিনে তাকে একটা ওয়ালম্যাট দিলাম। যাতে ছিল আমার নিজের হাতে আকা একটি গোলাপ ফুল। আমার কোনো টাকা পয়সা ছিল না। ওয়ালম্যাটটা বাধানোর জন্য আমি দুই দিন মজুরি করেছি। সেই টাকা দিয়ে ওয়ালমেটটা বাধিয়েছি।

আমার কষ্টগুলো দেখে বন্ধুরা আমাকে অনেক কথা বললো। নীরবতাই ছিল তখন অবলম্বন। অথচ এতো কষ্টের জিনিসটা যখন তাদের দেয়ালে ঝোলানো দেখা যায় ওয়ালম্যাটের উপরে টেপ দিয়ে মুছে দেয়া হয়েছে আমার নামটা।

একদিন যখন আমার ভীষণ ইচ্ছে হলো তাকে ভালোবাসার কথা বলার, আমি বললাম, যতো কথা বললাম ওই দিন সবই ছিল পাচ বছরের জমানো কথা। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কোন জিনিসটা অপছন্দ?

এক কথায় উত্তর দিল সব কিছু। তার এই কথাটা আমি হাস্যকরভাবে মেনে নিলাম। তাকে যে কেন এত ভালো লেগে গেল আমি তা জানি না। তার এমন একটা জিনিস আমার কাছে আছে যা ভালোবাসার প্রতীক করে রেখেছি। সে জিনিসের নামটা লুকিয়ে রেখেছি। কারণ এই লেখাটা সে পড়লে আমার কাছ থেকে নিতে চাইবে হয়তো। আমার প্রতি তার এহেন অবহেলার কারণে তার কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে খোদার হাতে। তবে তার প্রতি আমার অফুরন্ত ভালোবাসাটা থাকবে। ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আমি ভালো ভাষা দিয়ে এই কথা বলছি, আমাকে ভালোবাসতে না পার, তবে ঘৃণা করো না।

গারুয়া, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে

ডায়েরি

নজরুল ইসলাম জুয়েল

২৭ মে ২০০২

আজ শম্পার সঙ্গে দেখা হলো। কথা হলো। কাপা কাপা বুকে এই প্রথম তার সঙ্গে কথা বললাম। প্রথম কথা। অনেক আশার পরে এই আমার চাওয়া। কেন যে তাকে আমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেয়ে বলে মনে হয়! কিন্তু তার ভাব যেন কি রকম। আমার কল্পনার সঙ্গে মিল নেই। তবুও তো সে শম্পা যাকে দেখেছিলাম এক শীতের রাতে। শীতের মতোই ঠাণ্ডা। এতো কোমল। তার হাতটি যদি একটু ছোয়া যেতো।

২৯ মে ২০০২

আজ সত্যিই তার হাত ধরলাম। ধন্যবাদ পৃথিবী তুমি আমাকে এমন দিন দেয়ার জন্য। কাল সারা রাত ঘুমাইনি। তার ফোন পেয়ে আমি দিশেহারা। সে যে সত্যিই আমার সঙ্গে দেখা করবে ভাবিনি। তবে কি সত্যিই তাকে পেলাম? জানি না। তবুও তো তার হাতটি ধরেছি। এই আমার প্রাপ্তি।

২৯ জুন ২০০২

আজ আমার ভালোবাসার এক মাস। আমার স্বপ্নেরও এক মাস। এই এক মাস আমি ঘুমাইনি। শুধু স্বপ্নের সঙ্গে বসবাস করেছি। কল্পনাতে ভিজেছি, ঠিক আজকের অবিরাম বর্ষণের মতো। তবুও তো বাস্তব শম্পা শুধুই আমার।

৫ জুলাই ২০০২

আমি এখন সম্পূর্ণ রঙিন। তার ভালোবাসার স্নিগ্ধতায়। আমার আর চাওয়ার নেই। আমরা এখন মেঘ হয়ে ঘুরে বেড়াবো। আমাদের আকাশ হলো এই ভূমি। আমাদের কোনো পিছুটান নেই। শম্পা তুমি এতো সুন্দর হলে কার জন্য?

১০ জুলাই ২০০২

আজ শম্পাকে নিয়ে বৃটিশ কাউন্সিলে ছবি দেখে বের হলাম। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে তাকে মিশিয়ে ফেললাম বুকো। সে তখন কাপছে আমার বুকো ঠিক পাখির ছানার মতো। অভয় দিলাম। আমি দস্যু নই, কিছুই নেবো না, শুধু দিয়ে যাবো।

সে তখন চুপ।

২০ জুলাই ২০০২

তার সঙ্গে দেখা নেই দুই দিন। তার ধামের বাড়ি গেছে। পৃথিবী বড় শূন্য মনে হলো। কেন এমন হয়?

২৯ জুলাই ২০০২

আজ আমাদের ভালোবাসার দুই মাস। কাল শম্পার সঙ্গে দেখা হলো। জমে থাকা কথার মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে বর্ষণ করেছে শুধু। শুধুই কি কথা? আবেগ নেই? ছিল প্রচণ্ড দমকা বাতাসের মতো আবেগ। সেই বাতাসের আবেগে কেন যে টর্নেডো হয়নি সেটাই ভাবি।

৪ আগস্ট ২০০২

তার অভিমানবোধটি হয়তো একটু বেশি। আজ দেরি করে আসাতে একটুও কথা বললো না। কিন্তু জানতে চাইলো না কেন দেরি হলো। তাকে ফুল দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পাইনি। আজ প্রকৃতি কেমন জানি। তার মতো আমিও না হয় একদিন অপেক্ষা করে থাকবো। তার মান ভাঙাতে পারিনি। আমার মনটাই ভেঙে গেল।

৬ আগস্ট ২০০২

শম্পা ফোন করলো। আজ নাটক দেখলাম বেইলি রোডে। সন্ধ্যায় নির্জনতায় রিকশায় ফিরতে ফিরতে মনে হলো পথটি যদি সত্যিই শেষ না হতো! তার শরীরের দ্বাণ এখনো পাচ্ছি। রাতে ঘুমাতে পারবো তো?

২৫ আগস্ট ২০০২

আজ আমরা শপথ নিলাম। দুজন দুজনার। সাক্ষী আশপাশের পৃথিবী। আজ যেন তাকে নিজের করে পাওয়া ঠিক প্রকৃতির মতো।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০২

আজ তাকে বকলাম। এই প্রথম। সে চটপটি খাবে। আমি না বললাম। ও খেলো। ঝাল দিয়েই খেলো। ভীষণ ঝালে হেচকি উঠে গেল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম। ভীষণ কষ্ট লাগলো বুকে। কেন তাকে এতো ভালোবাসি।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২

আজ দুই দিন তার দেখা নেই। কোনো খবর নেই। ব্যাপার কি?

১০ অক্টোবর ২০০২

অনেক দিন পর তার সঙ্গে দেখা। কেমন যেন মিইয়ে গেছে। শুনলাম অসুস্থ ছিল। পাগল, একটি খবর দেবে না? ভেতরে তার থেকে যে বেশি অসুস্থ হয়ে গেছি।

১৪ নভেম্বর ২০০২

পরীক্ষার জন্য আমাদের দেখা কম হচ্ছে। পরীক্ষাটি শেষ হোক। মাকে ধরে তাকে একবারে নিজের করে নিয়ে আসবো। তাকে এ কথা বলতেই কেমন জানি লাজুকলতা হয়ে গেল। তার গালে তখন সন্ধ্যার গোলাপি আভা। চোখ দুটি সন্ধ্যার তারা। আমি তখন প্রাচীন এক কবি।

১০ ডিসেম্বর ২০০২

আবার শীতের বিকাল। এ রকম এক বিকেলে তার সঙ্গে দেখা। কুয়াশার প্রাচীর পেরিয়ে তাকে নিয়ে ঘুরবো সমস্ত শহর।

১৮ ডিসেম্বর ২০০২

তার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হলো। সে অসম্ভব রেগে গিয়েছিল। আমিও তাই। ফলাফল, চলে এলাম।

২২ ডিসেম্বর ২০০২

তাকে এখন ভীষণ বিরক্ত লাগে। ঠিক শীতের দিনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মতো। তারও কি?

২৯ ডিসেম্বর ২০০২

আজ আমাদের সম্পর্ক শেষ।

পুনশ্চ : শম্পা বলে কেউ নেই। এটি আমার এক কল্পনা। আমার এই না পাওয়া জীবনে তাকে বানিয়েছি যার সঙ্গে আমার কল্পসম্পর্ক। আবার আগামী বছর নতুন ডায়েরিতে নতুন করে লিখবো আমাদের অভিসার।

ডায়েরিটি আবার ঠিক স্থানে রাখলাম। এবার হাতে নিলাম আরেকটি ডায়েরি। তার পাতায় পাতায় আবার নতুন এক অভিসার কাহিনী। সেটি না হয় গোপন থাক।

টান্ডাইল থেকে

নষ্টা

তোমার মতো নষ্টা মেয়ে সবই পারে। এখন তুমি অন্য সমাজে একটা ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করে সবকিছু ভোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেো তাই না। তুমি ভুলতে পারবে না কলেজে থাকাকালীন প্রায় দুইটি বছর

হাতে হাত রেখে, ঠোটে ঠোট রেখে কতো ঘুরেছি। পরে সারাদিন ক্লান্ত হয়ে ফিরে সবার অজান্তে নিশি যাপন করেছি কোনো এক হোটেল।

হয়তো তোমার স্বামী গর্ব করে ভাবে আমি একজন সতী নারীকে পেয়েছি। অন্য সমাজের সুন্দরী একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিজেকে ধন্য মনে করেছে নিশ্চয়ই। অথচ তার স্ত্রীর সতীত্ব কেড়ে নিয়েছে অন্য একজন। জানি না তুমি কেন বিপথে পা বাড়ালে। আমার তো কোনো দোষ ছিল না। এর জন্য দায়ী তোমার অহংকারী বাবা মা। হয়তো তুমি তাই। তুমি পাল্টে গেছো। তোমাকে পাল্টানোর জন্য দায়ী করি তোমার শিক্ষককে। সে তো নিজে নষ্ট হয়েছে। তোমাকেও নষ্ট করেছে।

এতোদিন তুমি প্রমাণ করলে নষ্টা মেয়েরা সবই পারে। আমি জানি, তুমি আমাকে ভুলতে পারলে সুখের মুহূর্তগুলোকে ভুলতে পারবে না। কারণ তোমার শরীরের প্রতিটি কণা আমার জানা। আশা করি, তুমি তোমার প্রথম সন্তানের নাম আমার নামের সঙ্গে মিল রেখে রাখবে। কারণ আমি নিশ্চিত তার জন্মদাতা আমিই।

আজ সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে তোমাকে অনেক অনেক ঘৃণা ও ধিক্কার জানাই।

ইতি – অনাগত সন্তানের পিতা

নাম ঠিকানা বিহীন

চার পরিণাম

জোবাইদ ইবনে তিস্তা

মেয়েটির নাম শাপলা। আমাদের নিকট আত্মীয়। আমি তাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি। তাকে কখন যে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তা নিজেও জানি না।

তার জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সময় কোনো কারণে পরীক্ষার হলে গিয়েছিলাম, দুপুরে কনফেকশনারির দোকানে কিছু খাবার খেলাম। সেদিন তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম। বলতে গেলে সেদিনই তার প্রেমে পড়েছিলাম। ভাবলাম মনের কথাগুলো বলে ফেলি আবার ভাবলাম যাক না কিছুদিন। এভাবে কয়েক বছর চলে গেল।

ইতিমধ্যে সে খুব সুন্দরীও হয়েছে। কিছুদিন পরই তার পরীক্ষা, সিদ্ধান্ত নিলাম পরীক্ষার পর আমার মনের কথাগুলো তাকে জানানো।

পরীক্ষা শেষ হলো, ভাবছি এবার কিভাবে বলা যায় আর দেরি করা যাবে না কারণ সুন্দরী মেয়েদের হৃদয়ের সিট বেশিদিন খালি থাকে না। আমি বেশ শংকায় ছিলাম ফুলে ইতিমধ্যে ভ্রমর বসে গেছে কি না। আমার বিশ্বাস ছিল, যে ফুল চোখের সামনে ফুটেছে সে ফুলের ভ্রমর আমি ছাড়া কেউ হতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যে তাকে বলার একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম। ঠিক করে ফেললাম কিভাবে তাকে মনের কথাগুলো বলবো।

শাপলাকে বললাম তুই কি কাউকে ভালোবাসিস? ভালোবাসলে বল আমাকে, কোনো ভয় নেই।

সে বললো, না, কাউকে ভালোবাসি না।

বললাম, কাউকে ভালোবাসবি?

সে বললো, কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।

আমি বললাম, যদি বিশ্বস্ত কাউকে পাস তাহলে তাকে ভালোবাসবি।

সে বললো, আমাকে আবার কে ভালোবাসবে।

আমি বললাম, বাসবে বাসবে তোকে একজন এমন ভালোবাসে যা তুই কল্পনা করতে পারবি না। এমনকি সে তার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এভাবে মনের মধ্যে জমে থাকা অনেক কথাই তার সামনে বললাম। কিন্তু তখন পর্যন্ত জানতে দিলাম না আমিই তার পাগল প্রেমিক। এবার সে তার নামটি শুনতে চাইলো। আমি নানারকম ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম কে সে। যদিও সরাসরি বলতে পারতাম

আমিই সেই, কিন্তু পারছিলাম না। ইঙ্গিত দিয়ে যার কথা বোঝাতে চাইলাম, তার কথা না বুঝে অন্য একজনের নাম বললো। সেই মুহূর্তে আমার খুব খারাপ লাগছিল। কারণ আমি কতো হতভাগ্য যে, মনের কথাগুলো মনের মানুষটিকে বোঝাতে পারলাম না।

সে যখন অন্য একজনের নাম বললো, আমি বললাম, আরে সে না।

কিছুক্ষণ পর সে বললো, তাহলে কে আপনি?

আমি হ্যা সূচক মাথা নাড়লাম। এবার স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে আমি উত্তর চাইলাম, কিরে হ্যা না কিছু একটা বল।

সে বললো, রাকা যে আপনাকে ভালোবাসে।

রাকা হলো ওর বান্ধবী যে আমাকে ভালোবাসতো, কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসতাম না। কারণ আমার হৃদয়ে শুধুই শাপলা রয়েছে।

তাকে নানাভাবে বোঝালাম। বললাম, রাকার কথা বাদ দে। তুই ছাড়া অন্য কেউ আমাকে পাবে না। পৃথিবীর অন্য কোনো মেয়েকে আমি ভালোবাসতে পারবো না। এবার বল ইয়েস। কিন্তু ইয়েস সে বললো না। কারণ হিসেবে সে দেখালো রাকা যাকে ভালোবাসে সে তাকে কিভাবে...।

কেউ যদি প্রশ্ন করে তোমার জীবনে সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত কোনটি, আমি বলবো সে মুহূর্ত আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ যে মুহূর্তে সে না বলেছিল।

দুপুরে না খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সে খাবার জন্য আমাকে ডাকলো কিন্তু আমি দুপুরে কিছু খেলাম না। পরে শুনলাম সেও নাকি দুপুরে খেতে পারেনি। আসলে মেয়েদের অনেক কিছু মনে চাইলেও করতে পারে না।

বিকলে বাইরে যাচ্ছিলাম তখন সে বললো, আপনি যেটা বলেছিলেন ওটা ইয়েস।

আমি বললাম, তখন যে না বললি।

সে বললো, পরীক্ষা করছিলাম।

পরের দিন দুপুরে ভালোভাবে জানার জন্য আমার ঘরে ডাকলাম এবং বললাম, তুই যদি আমাকে ভালোবাসিস তাহলে আমার হাতে হাত রেখে বল আমাকে ভালোবাসিস এবং আমার হবি।

সে আমার হাতে হাত রেখে কথা দিল, আপনাকে ভালোবাসি এবং আমি শুধু আপনার।

দিনটি ছিল শুক্রবার ১২টা ২০ মিনিট। সে দিনটি আমাদের ভালোবাসা দিবস আর এভাবেই হলো আমাদের প্রেমের সূচনা।

পরে সে একদিন একটি খেলা খেললো। খেলাটিতে ভালোবাসার চারটি পরিণাম ছিল।

1. Love
2. Lost
3. Marriage
4. Enemy

খেলাটির ফলাফলে দেখা গেল আমাদের প্রেমের পরিণাম Marriage অর্থাৎ বিয়ে। দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য আমার সে হাতে চুমু দিল এবং আমিও তার হাতে চুমু দিলাম।

কোনো এক স্মরণীয় সন্ধ্যায় তাকে বললাম, তোর কাছে একটা জিনিস চাইবো দিবি?

সে বললো, কি?

আমি গালে হাত দিয়ে ইশারায় বোঝালাম। সে লজ্জায় লাল হয়ে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো। আমি হাত দুটি সরিয়ে তার দুই গালে এবং ঠোটে কিস করলাম। সেটি আমার জীবনে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এভাবে আমাদের প্রেম ভালোই চলছে কিন্তু তার নিঃসঙ্গতা আমাকে কষ্ট দেয়। প্রতি মুহূর্ত তাকে কাছে পেতে চাই, একপলক দেখতে চাই। কিন্তু আমি থাকি এক জায়গায়, সে থাকে অন্য জায়গায়। দূরে থাকলেও তাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না। সারাক্ষণ তাকে কাছে না পাওয়ার ব্যথা অনুভব করি। তা যে কতো কষ্টকর শুধু আমিই জানি। আমি জানি সেও তার জীবনের চাইতে আমাকে বেশি

ভালোবাসে। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, যে বিশ্বাস নিয়ে আমাকে ভালোবেসেছে তার সেই বিশ্বাস যেন রাখতে পারি।

ঠিকানা বিহীন

Djuice প্রেম

তানভীর হোসেন

২০০৫ সাল। বারো রমজানে আমার বন্ধু সোহাগের কাছে জানতে পারি Djuice-এর সিম মাত্র সাড়ে চারশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। এর বড় সুবিধা হচ্ছে রাত দশটার পর Djuice-এর যে কোনো নাম্বারে প্রথম মিনিটের পরে ফ্রি কথা বলা যায়। ভাবলাম Djuice-এর সিম কিনবো। কিনে কোনো মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেমের আলাপ করবো।

রমজানের মধ্যেই একদিন Djuice-এর সিম কিনি। কিন্তু আমার পোড়া কপাল! কোনো মেয়ের নাম্বার পাই না। আমাদের বাসার মোবাইলে থামীণ-এর সিম।

হঠাৎ একদিন বাসার মোবাইলে একটি কল আসে। কিন্তু কলটি ধরতে না ধরতেই কেটে দেয়।

Djuice থেকে কল এসেছিল। নাম্বারটা দেখে আমি উল্টা কল করি। একটি মেয়ের কণ্ঠ শুনে আমার খুবই আনন্দ লাগে। এরপর থেকে আমার Djuice নাম্বারে প্রায়ই কথা বলে থাকি। কিন্তু মেয়েটি কোনো দিন তার নাম বলেনি। এমনকি কোথায় থাকে তা পর্যন্ত বলেনি। তবে আমার সম্পর্কে সব কিছু তাকে বলেছি। ঈদের চার দিন পর হঠাৎ প্রবালের (ছদ্মনাম) সঙ্গে দেখা হয়। স্কুল জীবনে সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলেজ জীবনে আর তার সঙ্গে পড়া হয়নি। সে দুবাই চলে গিয়েছিল। সে বছর দুয়েক আগে বিয়ে করেছে। স্ত্রী দেশেই থাকে। প্রবালের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি এবং তার দামি মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখছি। এক সময় মোবাইলে কল আসে। ডিসপ্লিতে প্রথমে ময়না নাম ওঠে। এই নামটা প্রবালের স্ত্রীর নাম। এরপর যখন নাম্বারটা ওঠে তখন এক বিরাট ধাক্কা লাগে। এই নাম্বারটা Djuice নাম্বার। যে মেয়ে দীর্ঘ দিন ধরে আমার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলে এটা সেই নাম্বার। আশ্চর্য্য হই, বিবাহিত মেয়ে হয়ে কি করে এমন কাজ করলো! অনেক চিন্তা-ভাবনা করি। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। কারণ মোবাইলে কথা বলে বলে ময়নার প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। সবশেষে প্রবালের কথা চিন্তা করে এই Djuice প্রেমের সমাপ্তি টানি।

পৌদারবাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

কোকিল

আমি

কেমন আছো। অনেকদিন পর তোমাকে লিখছি। আমাকে মনে আছে তোমার নাকি ভুলে গেছো সব? হতে পারে, সব সম্ভব তোমার পক্ষে। আমি সেই মেয়ে, একদিন যে শুধু তোমাকেই চিনতো, ভালোবাসতো। হয়তো এখনো কোথাও সেই ভালোবাসার বীজটা লুকিয়ে আছে, যার প্রবাহে আজ এই লেখার উৎস বা সূচনা। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাস, গোখুলি বেলা, তুমি রোগী আর আমি ছিলাম অন্য রোগীর দর্শনার্থী। সেদিনই হাসপাতালে প্রথম পরিচয়। তারপর অনেক ঘটনা। হাসপাতাল থেকে ফিরে একগাদা বানিয়ে বলেছিলে আমার বান্ধবীর কাছে আমার নামে। শুনে রাগ হয়েছিল আমার। দুঃস্থমি করে বলেছিলাম প্রেম করবো। শুধু এটুকু, তাতেই তুমি চিঠি, কবিতা, ছবি কতো কিছু লিখতে শুরু করলে আমার নামে। ছদ্ম নামে উড়ে চিঠি পাঠাতে নিয়মিত।

তখন কেবল ক্লাস টেন-এ পড়ি, মনটা একটু অন্য রকম হলেও প্রেম করার সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না। ভীষণ ভয় পেতাম প্রেম-ভালোবাসাকে। আমি ছিলাম নীরব। অতএব লাফলাফি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। যে বান্ধবীর সঙ্গে দুষ্টুমি করেছিলাম সে এসে তুমি কি বলো না বলো সব গল্প করে।

এরই মধ্যে আমি এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমার চেহারা সুরত বিশ্বসুন্দরী না হলেও খুব কুশীলম। হয়তো তাই অনেক ছেলে পিছু নিতো ছোট থেকেই। কলেজে পা দিতেই এই সমস্যাটা বেড়ে গেল। কিছু বেয়াদব ছেলের ব্যবহার আমাকে খুব আপসেট করে দিচ্ছিল। প্রেম সংক্রান্ত সমস্যা আমাকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে লাগলো। এই সময় নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। তখন তোমাকে খুব মনে পড়তো। মনে হতো উড়ো চিঠি ও কবিতার জন্য তোমাকে কতো অপমান করেছি। যা-তা বলে গাল দিয়েছি। তুমি এসবের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাওনি।

তোমার পরিবারে তুমি একমাত্র ছেলে। বাবা নেই। তাই তোমার অনেক দায়িত্ব। আমারো বাবা নেই। বাবা হারানোর কষ্ট আমি বুঝি। ছাত্রজীবনে তোমাকে কতো দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে! এসব ভেবে তোমার জন্য আমার মায়া হতো। মনে হতো দুঃখটা ভাগ করে নিই তোমার সঙ্গে।

খারাপ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলাম তোমাকে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলাম ভালো লাগার কথা। এটাই ছিল আমার জীবনের বড় ভুল। এর পর থেকে শুরু হলো আমার কষ্টের অধ্যায়। প্রেমের ব্যাপারে ছিলাম প্রচণ্ড ভিত্ত। তাই আমাদের দেখা কম হতো। বাড়িতে দেখা করতাম না। তুমি দয়া করে কলেজে এলে তবে দেখা হতো, একটু কথা হতো। হয়তো কলেজে দেখা হওয়াটা তোমার পছন্দনীয় ছিল না। তাই হাতে গোনা কয়েকদিন মাত্র দেখা হয়েছে। তুমি চিঠিও কম লিখতে। তাই প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকতো। ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে তেমন জানা ছিল না।

সেবার ২০০০ সাল। এক বান্ধবী ফুল দিয়ে জানালো আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে, ভালোবাসা দিবস। তখন তুমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি কোচিং করছিলে। তাই তোমাকে মনে পড়লেও জানতাম তুমি আসবে না।

এ বছর তুমি রাজশাহী কলেজে ভর্তি হলে, আমি এইচএসসি পরীক্ষা দিলাম। আমি তখন বাড়িতে থাকি। কোনো কথা বলার সুযোগ ছিল না। চিঠি লেখার একটা ঠিকানা তোমাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু দয়া করে তুমি এ ভুলটিও করতে না। তাই কোনো যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন।

আমার রেজাল্ট হলো, পাবনাতে ভর্তি হলাম। এখানে এসে ভীষণ একা হয়ে পড়লাম। তোমার কথা বেশি করে মনে হতে লাগলো। আমিই নির্লজ্জের মতো তোমাকে চিঠি দিলাম। আবোরো শুরু হলো সেই বৈচিত্রহীন প্রেম। এবার তো রাজশাহী-পাবনার দূরত্ব অনেক বেশি। তাই এতো দূরত্ব অতিক্রম করে পরস্পরের কাছে চিঠি পৌছাতে অনেক সময় লাগতো। এতোদিনে আশপাশের পরিচিত, বন্ধু-বান্ধবদের দেখে আসল প্রেম কি বুঝতে শিখেছি। তোমার অবহেলাগুলো আগের চেয়ে তাই বেশি উপলব্ধি করতে শিখেছি। বুঝে গেছি তোমার ভালোবাসাহীন ভালোবাসা। বার বার ফিরে আসতে চেয়েছি কিন্তু আমি মরীচিকায় পড়ে গেছি। ততোদিনে এতোদূর গড়িয়ে গেছে আমার ভালোবাসা ফিরে আসা সম্ভব নয়। তুমি কখনো আমাকে নিয়ে খেলোনি। কিন্তু আমার ভালোবাসা নিয়ে এমন খেলা খেলেছো, ভালোবাসা নামের বস্তুটির এখন ক্ষতবিক্ষত জরাজীর্ণ অবস্থা। কোনো ডাক্তার-বদ্যি এই ক্ষত সারাতে পারবে না। তবু বিশ্বাস ছিল, একদিন তোমার সত্যিকারের ভালোবাসা পাব। তোমাকে ভেবে কতো রাত নিরুন্ম কেটেছে তার হিসাব নেই। কতো ভালোবাসা দিবস চোখের পানি ফেলে পার করেছি জানি না।

নিজেকে প্রশ্ন করি, কি দোষ করেছি, কেন এতো অবহেলা? কোনো উত্তর পাইনি। স্বজনরা বলেছে, নতুন করে কাউকে ভালো, ভুলে যাও ওসব স্মৃতি। পারিনি। এর মধ্যে জানলাম পাগলের মতো ভালোবাসে একজন আমাকে। তোমার কথা সব জেনেও। তাকে বার বার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি। বুঝিয়ে, অপমান করে। কোনো লাভ হয়নি। বলেছি, পুরুষের ভালোবাসা বিশ্বাস করি না। কিছুতেই ফেরাতে পারিনি। তার ভালোবাসা আমার সব বিশ্বাস ভেঙে দিল। জানলাম, সব পুরুষ হৃদয়হীন নয়।

প্রেম করা সম্ভব নয়, তাই বিয়ে। নাটকীয়ভাবেই বিয়ে হলো তার সঙ্গে। তোমাকে শেষবারের মতো ডেকেছিলাম, তুমি আসোনি। সময় হয়নি তোমার। যদিও স্বামীর বুকো শুয়ে বিশ্বাসঘাতক মন, বিশ্বাসঘাতক ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে দেয়। তবুও আমি সুখী। কারণ আমার স্বামীর কাছে সত্যিকারের ভালোবাসা পেয়েছি। বিয়ের দুই বছর হতে চললো সে আমাকে প্রথম দিনের মতোই ভালোবাসে। প্রথমে তাকে ভালোবাসতে পারতাম না। বার বার তোমার কথা মনে পড়তো। কিন্তু তার ভালোবাসা, সরলতা, ধৈর্য, সহনশীলতা আমার ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছে। তাকে দেখলে বিশ্বাস হয়, পুরুষরা ভালোবাসতে জানে।

কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসলে না কেন? ভালো না বাসলে প্রেম প্রেম খেলা করলে কেন? কিছু ছেলেও বুঝি মেয়েদের মতো ছলনা করে? যদি আমার এই লেখা পড় তবে আমার কথার উত্তর দিও। সবশেষে বলি, ভালো থেকে। দোয়া করি কেউ যেন তোমার সঙ্গে ছলনা না করে।

পূর্ণ নাম বিহীন, ঢাকা থেকে

পার্ক

বিয়ে আমরা করবো ঠিক করেছি কিন্তু এখন নয়। তাই পারিবারিকভাবে যাতে কোনোরূপ বাধা না আসে সে চেষ্টায় আছি। এ জন্য বাসায় আমরা তেমন দেখা করি না। বাইরেই সাধারণত সময় কাটাই। ইদানীং আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম এক পার্কে। পার্কে বসার তেমন জায়গা খুজে পাচ্ছিলাম না লোকের ভিড়ে। যেখানে বসলাম সেখানে কিছু দুষ্টু মেয়ে আমাদের বিরক্ত করছিল। সেখান থেকে উঠে গিয়ে একটি গাছের গোড়ায় বসি।

অনেকক্ষণ পর দুইজন বখাটে ছেলে আমার কাছে ট্যাক্স চাইলো একশ টাকা, প্রেম করার জন্য। এতোদিন থেকে শুনে এসেছি ট্যাক্স দিতে হয় দোকানপাটের, ব্যবসা-বাণিজ্যের। কিন্তু এখানে প্রেম করারও ট্যাক্স দেয়ার নিয়ম শুরু হয়েছে দেখছি। ট্যাক্স দিতেই হলো পঞ্চাশ টাকা, অপরিচিত জায়গা বলে।

এ রকমভাবে প্রেমিক-প্রেমিকাদের পাচ মিনিট গল্প করার কারণে যদি পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বেরিয়ে যায় তাহলে অচিরেই দেখছি সেই প্রেমিক-প্রেমিকাদের লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করার টাকাটাও থাকবে না।

তাই বিশ্বের সব প্রেমিক-প্রেমিকাকে এই দোয়া করতে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আমাদের এই জনবহুল বাংলাদেশে এমন কোনো হৃদয়বান ধনী প্রেমিক-প্রেমিকার আবির্ভাব ঘটুক যারা অচিরেই দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলায় অন্তত একটি করে পার্ক তৈরি করুক যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মনের কথা জানাতে কিংবা জানতে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

নিভে যাক্সা প্রদীপ

কাজী আবদুল ওহাব

২০০৫-এ বিজয় এবং জাতীয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে অফিস থেকে ফিরলাম বিকাল সাড়ে তিনটায় নোয়াখালী। সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসন্নতা সারা শরীরে। মোবাইল বেজে উঠলো। ছোট ভাই বললো, ভাইয়া মা মারা যাচ্ছেন এই মাত্র আমরা ইমারজেন্সি রুমে আনলাম।

ছুটে গেলাম হাসপাতালে। বন্ধের দিন, ভর্তি শেষে ডাক্তার, ওষুধ, সিট কিছু না পেয়ে অগত্যা ফ্লোরে অনেকের মাঝে মাকেও রাখলাম এবং আশ্চর্যজনকভাবে দেখলাম স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, বন্ধু,

আত্মীয়স্বজনের ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগলো। আর মনে হলো, দুইটি কারণে সবাই একত্রিত হই। এক বিপদে, দুই খুশির দিনে। এ সময় আবার ফোন!

হ্যালো কে?

আমি ঝর্না।

উত্তর ও গলার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বললাম, আমার নাম্বার পেলে কিভাবে?

ইচ্ছা করলে সব পাওয়া যায়। সে বললো।

না, সব পাওয়া যায় না, যেমন তোমাকে পাইনি। ঠাণ্ডা গলায় বললাম আমি।

তুমি এখন কোথায়?

নোয়াখালী সদর হাসপাতালে।

হাসপাতালে কেন?

মা মনে হয় কিছুক্ষণ পর মারা যাবেন, আমি মায়ের কাছে আছি।

হঠাৎ লাইন কেটে গেল।

আমার ভেতরে আগুন জ্বললেও পুড়ি না। ভেঙে গেলেও সহজে মচকানি না। শুধু আমার বিশ্বাসগুলো ভেঙে যায়, কাচের চুড়ির মতো। পলকহীন সাপের চোখের মতো চেয়ে থাকি দূর-দূরান্তে কিংবা অন্ধকার অতীতে। অজানা আশংকায় প্রাণ কেপে উঠলো। ইদানীং যেমন কিছু হজুর দেখলে কেপে উঠি বাসে কিংবা অফিস আদালতে।

ওষুধের গুণে নাকি আল্লাহর হুকুমে মা চোখ খুললেন এবং নড়েচড়ে উঠলেন। মাথা একটু বেসামাল, ভুল দেখলাম নাতো। কাছে গিয়ে মাকে ডাকলাম। মা আমাকে দেখলেন, আমি পৃথিবী দেখলাম। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কারণ হাসপাতালে মায়ের আশপাশে আপাদমস্তক ঢাকা বোরখা পরা এক মহিলা ঘুর ঘুর করছে। শুধু দুটি কালো চোখ দেখা যায়। মাঝে মধ্যে আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে তার চোখ দেখেই আমি বুঝে গেছি ঝর্না এসে গেছে।

কিছুদিন আগে পড়েছি ইরাকে মহিলা আত্মঘাতী হামলা হয়েছে। সে এখানে এসে কি কাণ্ড করে বসে। বুকের ভেতরটায় ছোট্ট একটা লাফ মারল। কি দরকার ছিল ২১ বছর পর এতো কাছে আসার। মনে মনে ভাবছি কিছুটা দূরত্বে বারান্দায় চলে গেলাম। লুকাতে চাইলেও ওই একজোড়া চোখ আমাকে অনুসরণ করে খুব কাছে এসে বললো, আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি।

মাথা তুলে এই প্রথম চোখে চোখ রাখলাম। আমার অতি আপনজনে হাসপাতাল গিজগিজ করছে। তার সঙ্গে এভাবে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও এ মুহূর্তে আমি অপারগ। এটা মুখে না বললেও সে বুঝতে পারে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে হাটছে হাসপাতালের করিডোর দিয়ে। রহস্যময়ী নারীদের রহস্য ভেদ করার জন্য দেবতার প্রয়োজন পড়ে না, একজন অনুসন্ধানী পুরুষই যথেষ্ট।

সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্ন রাখলাম, তুমি আমার মা নাকি আমাকে দেখতে এসেছো?

দুটোই, বললো ঝর্না।

ঠিক আছে তুমি দুটোই দেখেছো!

আর চোখ দুটি ছাড়া তোমাকে আমার কিছুই দেখা হয়নি। দয়া করে তুমি এখন বিদায় নিতে পারো।

আমার উচ্চারণে অথবা বলার ভঙ্গিতে কিছুটা অনুরাগ ভরা অভিমান ছিল হয়তো।

তাৎক্ষণিক সে বললো, নিজের ইচ্ছায় এসেছি এবং নিজের ইচ্ছাই যাবো। কারো কথায় আমি একচুলও নড়বো না।

মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ গোদের উপর বিষফোড়া নাকি। নারীর কারণে বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। আর হতে দেয়া যায় না। ক্ষমতালোভী, নারীলোভী, অর্থলোভী অনেক দেখেছি, উত্থান শেষে কিছু ধ্বংস দেখেছি।

কিছুটা ব্যস্ততার অভিনয় করে দ্রুত রোগীর ওয়ার্ড ঘুরে নিচে গেইটে চলে এলাম আমার ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। একজোড়া চোখ আমায় অনুসরণ করে গেইটে আমার কাছে এসে দাড়ালো আর আমার মেয়ের হাতে কিছু টাকা গুজে দিতে চেষ্টা করলো। না পেরে কঠোর দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগলো। বিষয়টি হালকা করার জন্য বললাম, তোমাকে র‍্যাব দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ পোশাকে তোমাকে যে কেউ সন্দেহ করবে এবং আমি তো অবশ্যই...। বলেই চিন্তা করলাম এতো বেশি কথা বলা তার সঙ্গে উচিত হয়নি।

কারণ কোনো একদিন সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমার ভালোবাসাকে চরম অপমান করেছিল। কোথায় যেন পড়েছি, যে ভালোবাসাকে অপমান করে জীবনে সে ভালোবাসা পায় না।

একদিন আমার ছোট দুঃখগুলো বিন্দু বিন্দু জল হয়ে যে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল, আজ সে চোখে পানি নেই। শুধু দেখলাম, কয় ফোটা অশ্রু তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। জানি না এটাই কি নিয়তি।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

মুশকিল আহসান

মোহসেন আরা করুনা

এক ভ্যালেনটাইনস ডেতে আমি ও সে সন্ধ্যার পর ইডেন কলেজের পশ্চিম পাশে রাস্তার ধারে বসে গল্প আর অতি মাত্রায় পুষ্টিকর বাদাম ভাজার সৎকার করছিলাম। তার বাসা আজিমপুর কলোনিতে। আমরা দুজন কখনো এখানে বসি না। বলা তো যায় না, কখন পরিচিত কার চোখে পড়ে যাই!

সেদিন ভ্যালেনটাইনস ডে উপলক্ষে অনেক ভিড় জমেছিল বিভিন্ন জুটির। তাই পরম নিশ্চিত্তে এবং মমচিত্তে থৈ থৈ করতে করতে সেখানেই আড্ডায় বসে গেলাম। ভাবলাম, কেউ চিনতে পারবে না। ভাগ্যের ফের, প্রেম দেবতার দৃষ্টি আমাদের প্রতি যে কোনো কারণেই হোক খুব একটা প্রসন্ন ছিল না। হঠাৎ দেখি তার বাবা রাস্তা দিয়ে বাসায় ফিরছেন। আমাদের কথার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি দাড়িয়ে বোঝার চেষ্টার করেন আদৌ আমরা দুজনই কি না।

যখন তিনি দাড়িয়ে পড়েন হঠাৎ কি ভেবে আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে তাকে দেখে ফেলি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বোঝানোর জন্য তার হাতে চাপ দিই। কিন্তু গাধাটা না বুঝে প্রেমে গদগদ হয়ে আমার হাত ধরে বসে থাকে। এবার আমি কাছে গিয়ে তাকে পেছনে ইশারা করি। তার তখন বাজপড়া মানুষের মতো অবস্থা। বুঝলাম বাবা মজানু এবার ফেসে গেছে এবং বাবার হাতে রামধোলাই খাবে। আমরা দুজনই একদম চুপ। তিনি কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে হনহন করে হাটা শুরু করেন বাসার দিকে। এদিকে ভয়ে তখন আমার কাদো কাদো অবস্থা। আমি তাকে বললাম, ধরা তো খেলে এখন কি হবে?

সে বললো, কি আর হবে, ধোলাই খাব।

আমি মন খারাপ করে বসে আছি।

সে হঠাৎ উঠে বললো, তুমি এখানেই বসো আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরছি।

আমি প্রায় আধ ঘণ্টা বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি সোনার চাদ দস্ত বিকশিত করে আমার দিকে আসছে। এসে জানালো তার বাবা যখন আমাদের দেখে বাসায় ফিরছিলেন সে তার আগেই রিকশা নিয়ে হুড তুলে তার পাশ দিয়ে বাসায় ঢুকে কাথা গায়ে গভীর ঘুমের ভান করে।

তার বাবা হস্তদস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে কাথা সরিয়ে বলে সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছো কেন?

সে বলে, জ্বর এসেছে।

তার বাবা কিছুটা আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এতক্ষণ এখানেই শুয়েছিলে?

হ্যাঁ আশ্বা। কেন, কি হয়েছে?

না, কিছু হয়নি। বলে তিনি রুম থেকে বের হয়ে যান।

পরে সে উঠে জ্বরের ওষুধ কেনার কথা বলে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসে। সেই টাকায় আমরা দুজন মিলে চটপটি খেলাম।

আজ পর্যন্ত তার বাবা মানে যিনি বর্তমানে আমার শ্বশুর জানতেও পারেননি, ওই দিন তিনি চোখের ভুল করেননি, কানেও ভুল শোনেননি।

ঢাকা থেকে

চিন্তা

তাজ

আমার সহকারী হিসেবে ইউগান্ডা থেকে নতুন এসেছে ফ্রাংক সোসায়া। ফ্রাংকের খুবই আগ্রহ ইন্দোনেশিয়ার ভাষা শেখার। সে সুযোগ পেলেই সবাইকে বলে *তেরিমা কাসিহ* – যার অর্থ ধন্যবাদ। বললাম, ফ্রাংক, *তেরিমা কাসিহ* খুবই সাধারণ একটা শব্দ। তুমি এ ধন্যবাদকেই আরো মার্জিত ও পরিশীলিত ভাষায় ব্যক্ত করতে পারো। এ জন্য তোমাকে বলতে হবে *আকু মেনচিন্তাই* মু।

ফ্রাংক লিখে নিল এবং মুখস্থ করতে লাগলো।

সন্ধ্যায় আরো কয়েকজন সহকর্মী মিলে হোটеле ডিনারে গেলাম। আলফানসো খুবই স্মার্ট ওয়েটার এবং ইংরেজিটাও যথেষ্ট সাবলীল।

খাবার পরিবেশন শেষে ফ্রাংক বিগলিত একটা হাসি দিয়ে বললো, আলফানসো, আকু মেনচিন্তাই মু।

বেচারি আলফানসোর অবস্থা দেখার মতোই হয়েছিল। প্রথম ক্লাসে বেকুবের মতো হতবাক হয়ে মুখে প্রফেশনাল হাসি নিয়ে দাড়িয়েছিল এবং কয়েক মুহূর্ত পরে শুধু বলতে পেরেছিল *সামা সামা* (সেম টু ইউ)।

ফ্রাংক অত্যন্ত হাস্যরস প্রিয় এবং বড় মনের মানুষ। নইলে হয়তো আমাকে এক হাত দেখে নিতো। আকু মেনচিন্তাই মু কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় *চিন্তা* অর্থ হচ্ছে ভালোবাসা। এই *চিন্তা* নিয়ে তাদের চিন্তা ও দুশ্চিন্তার কোনো শেষ নেই। সম্ভবত এখনো পর্যন্ত কোনো গান শুনিনি যার মধ্যে চিন্তা নেই। এখানে নব্বই শতাংশ ইয়াং ও টিনএজারদের বয় ফ্রেন্ড বা গার্ল ফ্রেন্ড আছে। সামাজিকভাবে তারা খুবই উদার সম্পর্কের বিষয়ে। তারা এক সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাচ্ছে। নয় দশটা পর্যন্ত বাইরে থাকছে আবার সমঝোতার ঘাটতি দেখা দিলে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেলছে। এ নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। ছেলে ও মেয়ের পরিবারের সামাজিক অবস্থানগত ব্যবধানও তেমন একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

আমার এক সহকর্মীর ব্যাংকার বোন খুবই সুন্দরী, হজ করে এসেছে এবং ধার্মিক। তারও বয় ফ্রেন্ড আছে এবং তারা প্রায়ই বাইরে সন্ধ্যার পর সময় কাটায়। আমার অ্যাডমিন অফিসারের বাবা রিটারার জাজ এবং সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তার বয় ফ্রেন্ডটি খুবই সাধারণ ফ্যামিলির এবং একটি রেস্তুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করছে। বড় কথা হচ্ছে, তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা করে। হট করে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় না। যৌন সম্পর্কের বিষয়ে সামাজিকভাবে তারা খুবই রক্ষণশীল। বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে আমাদের দেশের মতোই তারাও খুব ঘৃণার চোখে দেখে। তারপরও যে কিছু ঘটে যায় না তা নয়।

২০০৫ সাল ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। কিন্তু আচে প্রদেশে বিদ্রোহী গেরিলাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি বা বিমান দুর্ঘটনায় দেড় শতাধিক প্রাণহানি হয়। সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি হচ্ছে একটি ভালোবাসার দুর্দমনীয় বহিঃপ্রকাশ।

আচে প্রদেশের অধিবাসী বা আচেনিজরা আচেকে আগের মক্কা (Mecca of the East) বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এখানে পরিপূর্ণ শরিয়া আইন প্রচলিত এবং রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক আইন অকার্যকর। এখানকার ছেলেমেয়েরাও চিন্তাবিদ। অন্য প্রদেশগুলোর মতো তারা অতোটা খোলামেলা নয়। এখানে

মেয়েদের সব সময় স্কার্ফ দিয়ে মাথা আবৃত করে রাখতে হয় যদিও ওড়না দিয়ে বুক এবং লম্বা জামা দিয়ে নিতম্ব ঢাকার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ইন্দোনেশিয়ার অন্য সব প্রদেশের মতোই। প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসার প্রকাশ্য বা দৃশ্য বহিঃপ্রকাশ বা অন্যথ্যে তথাকথিত বেহায়াপনার কথা আছে প্রদেশে কেউ কখনো কল্পনা করতে পারে না। সেখানেই ঘটে যায় ২০০৫ সালের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা।

আছে প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্যাম (গেরাকান আছে মারদেকা বা স্বাধীন আছে আন্দোলন) গেরিলাদের সঙ্গে সরকারের শান্তি চুক্তির প্রাক্কালে সরকার আছে প্রদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে। ঘটনাস্থল লঙ্কমাউয়ে আছে প্রদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। এ শহরটি আছে প্রদেশের অন্য শহরগুলোর তুলনায় একটু উদার তবে উল্লেখযোগ্য নয়। এর পেছনে কারণ হয়তো এ শহরে বহু আগে থেকে বিদেশিদের আনাগোনা। মবিল এখানে বহুদিন ধরে খনিজ তেল উত্তোলন করছে।

লঙ্কমাউয়ে-র সুন্দরী তরুণী আটাশ বছরের ইউনি। সেও ধারণা করতে পারেনি কি করতে যাচ্ছে। অন্য অনেকের মতোই সে সমুদ্র বন্দরে এসেছিল এখানে অবস্থানরত সৈনিকদের বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাতে। বিশেষ করে তার ভালোবাসার মানুষ পাচশ পনেরো ব্যাটালিয়নের সৈনিক ইউডি-কে। সারা দেশে মানুষ মেট্র টেলিভিশনের পর্দায় দেখছিল সৈনিকদের বিদায়। হঠাৎ দর্শকদের হৃদস্পন্দন থমকে দেয় যে দৃশ্যটি তা হলো, ইউনি ছুটে এসে ইউডিকে জড়িয়ে ধরলো এবং গভীর চুমুতে নিবিষ্ট হলো। উপস্থিত জনতার হতবিস্ময়তা কাটতেই মেয়েরা ছুটে এসে টেনে সরিয়ে নিল ইউনিকে এবং কয়েকজন সৈনিক সরিয়ে নিল ইউডিকে। কয়েক মুহূর্ত পর ইউনি সঙ্গীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে গেল সৈনিকদের মাঝে। জড়িয়ে ধরলো ইউডিকে। আবার চুপন সঙ্গীরা তাদের ছাড়িয়ে না নেয়া পর্যন্ত। দুজনেই অশ্রু মুছতে মুছতে দূরে সরে গেল। ঘটনা এখানেই শেষ নয়।

ইউডি যখন জাহাজে উঠতে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে ইউনি দিল আরেক ছুট। কেউ রুখতে পারলো না। জাহাজের সিঁড়ির মুখে শেষবারের মতো তারা চুপনে আবদ্ধ হলো এবং একই দৃশ্যের মাধ্যমে যবনিকা। বান্ধবীরা ইউনিকে এবং সহকর্মী সৈনিকরা ইউডিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুব্ধ সেনা ইউনিট কমান্ডার পাশে থাকলো ইউডি জাহাজে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত।

বিষয়টি উপস্থিত প্রাদেশিক সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সুপিয়াদিন আদি সপুত্রাকে যথেষ্ট বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। তিনি মন্তব্য করেন, আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা দুজনে যা করেছে তা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি অঙ্গীকার করেন, এ রকম ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। প্রাদেশিক সেনা মুখপাত্র এরিক সুতিকো মন্তব্য করেছিলেন এভাবে, ইট ওয়াজ এ স্পনটেনাস অ্যাঙ্ক কমিটেড বাই টু লাভার্স। দি শিপ ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ দি পোর্ট। দি সোলজার হ্যাজ বিন শলড বাই দি কমান্ডার।

বিষয়টি অভিভূত করেছে যে এই দৃশ্য টিভির পর্দায় দেখার পর সারা দেশের প্রগতিশীল মানুষ সোচ্চার হয়েছে যেন তাদের কোনো রকম শাস্তির মুখোমুখি হতে না হয়। কারণ আচের শরিয়া আইন ও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক আইন স্বভাবতই ইউনি ও ইউডির বিরুদ্ধে প্রয়োগ হওয়ার কথা। কটরপন্থী আচেনিজ তাদের শাস্তি দাবি করলেও প্রতিদিন পত্রিকা ও টিভি স্পট সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মানুষ তাদের ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন জানায় কর্তৃপক্ষের কাছে।

ঘটনার পর ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে একটি এন্টি পর্নোগ্রাফি বিল উত্থাপিত হয় যার মধ্যে রয়েছে চোট ও জিভের সমন্বয়ে চুমু বা যাকে সহজে ফেঞ্চু কিস বলা হয়।

এই চুমুর প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে পাচ বছরের কারাদণ্ড বা উনত্রিশ হাজার ইউএস ডলার কিংবা সমমূল্যের ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়ার নগদ জরিমানা। তবে তাদের বর্তমান অবস্থা আমার জানা নেই। দুই একজন সহকর্মীকে বলেছি খবর পেলে জানাতে।

তবে ফ্রাংককে আকু মেনচিস্তাই মু শেখানোর ধারণা আমার মধ্যে হয়তো কখনোই জন্মাতো না যদি অপর একটি ঘটনা না ঘটতো।

কয়েক মাস আগে আমরা ব্রাস্তাগি পাহাড়ে বেড়াতে যাই। জায়গাটি পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। প্রকৃতিক সৌন্দর্যের মেলা। ওই পাহাড়ের চূড়াতেই শহর, পর্যটন স্পট, হোটেল-রিসর্টে ভরা। একটা নামকরা গলফ কোর্সও আছে। সেখানের বিরাট এক মার্কেটে গিয়েছিলাম। একটা দোকানে ঢুকে অল্প কিছু কেনাকাটা করে বেরিয়ে আসার মুখে দোকানি মেয়েটি আমার স্ত্রী ও আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমাদের যে অবস্থা হয়েছিল ওই সময়ে তা পরে একবার দেখেছিলাম আলফানসোর মধ্যে। মেয়েটি আমাদের বেকুব ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করলো এটা কোনো খারাপ কথা কি না।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথা থেকে এই কথা শিখেছে।

মেয়েটি জানায়, সে মালয়শিয়ায় কাজ করার সময় বাঙালি সহকর্মীদের কাছ থেকে এ কথা শিখেছে।

তার শেখা মতে, আমি তোমাকে ভালোবাসি কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে ধন্যবাদ। স্ত্রী ও আমি মেয়েটিকে কথাগুলোর অর্থ বললাম, লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তবে সে সত্যিই লজ্জা পেয়েছিল এবং বার বার আউড়াচ্ছিল *দোনোবাড* কারণ ইন্দোনেশিয়ান উচ্চারণে ধ এবং ন+n যুক্তাক্ষর নেই।

মালয়শিয়ার সরকারি দাবি মতে, মোট কর্মরত ইন্দোনেশিয়ানের সংখ্যা সাত মিলিয়ন। তাদের মধ্যে পাচ মিলিয়ন কাজ করে অবৈধভাবে কোনো রকম ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া। মালয়শিয়ান সরকার তাদের বিষয়ে নিদারুণ উদাস। কারণ এই বিশাল কর্মীবাহিনী বেশ শস্তায় শ্রম বিক্রি করে। তারা স্থায়ী শ্রমিক নয়। ছয় মাস বা এক বছর পর তারা দেশে ফিরে আসে এবং কিছুদিন পরে আবার যায়। মূলত উত্তর সুমাত্রার যুব সমাজ এই দলে মেজরিটি কেননা মেডান-জাকার্তা প্লেন ভাড়া একশ ডলার। কিন্তু মেডান-কুয়ালা লামপুর প্লেন ভাড়া মাত্র পয়ত্রিশ চল্লিশ ডলার।

উল্লেখ্য, এ অঞ্চলের বারটি দেশের ভ্রমণে দেশের পার্সপোর্টধারীদের জন্য কোনো ভিসা লাগে না। আমার বাসার গৃহকর্মীও এক সময় মালয়শিয়ায় কাজ করতো। ওখানে কাজ করার সময় প্রেমে পড়ে যায় অপর এক ইন্দোনেশিয়ানের এবং তাকে বিয়ে করে। কিন্তু কাজ করে চারটি বাচ্চা সামলাতে পারে না। তাই দেশে ফিরে এসেছে। মালয়শিয়ার কঠোর জীবনও তাদের চিন্তামুক্ত থাকতে দেয় না। তারা যায় একা, ফিরে আসে জোড়া বেধে। কোনো কোনো জোড়ার কোলে ঝুলতে থাকে উৎকৃষ্ট চিন্তার ফসল।

মেডান, উত্তর সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া থেকে
mdasaduzzaman@gmail.com

অপূর্ব
নূরুল আমীন

মানুষ মানুষকে এতো বেশি ভালোবাসে তা বাল্যকাল থেকেই অনুভব করে আসছি। এরপর জানতে পারি ভালোবাসা দিবসও রয়েছে। তাহলে এবার ভালোবাসার গল্প বলি।

বয়স তখন নয় দশ হবে। আমার বাবা আশির দশক থেকে সউদি আরবে রয়েছেন আজ পর্যন্ত। টেলিফোন কি তখনকার দিনে থামের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই দেখেনি এবং জানতো না। প্রবাসে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি। তাও একটি চিঠি প্রেরক থেকে প্রাপকের হাতে পৌঁছতে দুই কুড়ি দিন নিঃসন্দেহে লেগে যেতো। তবুও চিঠির প্রত্যাশায় থাকতো মানুষ। চিঠি পেলে আকাশের চাদ পেয়েছে বলে মনে হতো। ছোটবেলায়ই বুঝতে সক্ষম হই সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা কেমন।

বাবার চিঠি আসতো দুই তিন মাস পর পর। মা পড়ে শোনাতেন সবাইকে। দাদা দাদি হৃদয় উন্মুক্ত করে শুনে মনকে সান্ত্বনা দিতেন। বার বার মাকে প্রশ্ন করতেন ছেলে আর কি লিখেছে?

মা তখন দাদা দাদিকে সাধ্যের ভেতর বুজ দিয়ে যেতেন। একদিন একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এলো, সঙ্গে বাবার সুন্দর কয়েকটি ছবি। দাদা দাদি ভীষণ খুশি ছেলের ছবি পেয়ে। যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এরপর

চিঠি আসতে দেরি হলে বিশেষ করে আমার দাদি তার ছেলের চকচকে ছবিখানা বাক্স থেকে বের করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু দেখতেন। এ করেই বসে থাকেননি, একদিন দেখি বাবার ছবিকে গোসল করাচ্ছেন! পরে তেল দিচ্ছেন এবং খাওয়ার সময় হলে ভাত ছবির সামনে নিয়ে বলতেন, বাবা খেয়ে নাও। আজ অনেক দিন হলো মায়ের হাতের ভাত খাওয়া হয়নি। রাগ করো না বাবা, চটপট খেয়ে নাও।

তারপর নিয়মিত এভাবে করে যেতেন। আমি দাড়িয়ে দেখতাম ও দাদির সঙ্গে দুষ্টমি করে বলতাম, আচ্ছা দাদি, বাবা কি আপনার কথা শুনছেন? বাবা কি খাবার খাচ্ছেন?

তখন দাদি বলতেন, যেদিন বাবা হতে পারবে সেদিন প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবে! দাদির এ সব আচরণ দেখে আমি অনেক দুষ্টমি করলে কখনো উত্তেজিত বা রাগান্বিত হতে দেখিনি। শুধু যুগল নয়নে ছেলেকে দেখার অধীর আত্মহের আভা দেখা যেতো। এই মানুষটি আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। এ রকম ভালোবাসেনি কেউ আমাকে। যতোক্ষণ আমার উদরে আহার যায়নি তিনিও অপেক্ষা করতেন ততোক্ষণ। ঘুম থেকে জাগার পর রাতে ঘুমাতে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছায়ার মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন আমার ওপর।

আমার এই প্রিয় মানুষটি ইহকালের জীবন সমাপ্ত ঘোষণা করে পরকালে চলে গেলেন। আমি হয়ে গেলাম ভালোবাসার এতিম।

আজ প্রবাসে জীবন কাটাচ্ছি। প্রবাসে আসার পর মায়ের ভালোবাসা কি তা টের পাচ্ছি। সপ্তাহে দুই তিন বার মোবাইল ফোনে মায়ের সঙ্গে কথা না বললে মনে শান্তি আসে না। দাদির সেই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন হলো। আফসোস, তখনকার দিনে মোবাইল ফোন থাকলে দাদি তার ছেলের সঙ্গে কথা বলে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন।

ভালোবাসা দিবসে আজ শ্রদ্ধা ও শত সালাম জানাই দাদির সেই খাটি মমতা, বিশুদ্ধ ভালোবাসা, নির্মল স্নেহ এবং মমতাময়ী আদর-সোহাগের জন্য ছেলের প্রতি।

সউদি আরব থেকে

পাগলি

কামরুজ্জামান সৈকত

সুমি নামের মেয়েটি কাপ, পিরিচ, গ্লাস প্রতিদিন ভাঙে। পোশাক-আশাক, সাজগোছ কোনো কিছুর কমতি নেই। অথচ সুমি ঘরের ভেতর ভাঙুর করে।

এ পাড়ায় নতুন ঘর ভাড়া নিয়েছি। তাই বুঝে উঠতে পারছি না আসলে কি হচ্ছে।

একদিন রাতের বেলা কান্নার সুর শুনতে পেলাম। এমনভাবে কান্নার শব্দ আসছে যেন ঘরের ভেতর কেউ মরে গেছে।

দরজায় টোকা দিয়ে দরজা খুলতে বললাম।

অনেক সময় পর দরজা খুললো।

জানতে চাইলাম কি হয়েছে? অনেক সময় ধরে কান্নার শব্দ পাচ্ছি। প্রায়ই ভাঙুরের শব্দ পাই। ঘরে তো বাচ্চা-কাচ্চা নেই। তাহলে কে ঘটাচ্ছে এসব?

আমার কথা বলা শেষ না হতেই আমাকে জাপটে ধরলো সুমি। বললো, তুমি আমাকে বাচাও, তারা আমাকে মারে। আমাকে কাপ পিরিচ ভাঙতে দেয় না। ঘর থেকে বের হতে দেয় না, সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে দেয় না। এরকম থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

সুমির ভাবী বললেন, সুমির একটু মাথা গরম। ইদানীং তার পাগলামি বেড়েছে। এতো বড় মেয়ের পাগলামি সামলানো দায়। আপনি তো পাশের ঘরে নতুন এসেছেন, কি বলবো আপনার কাছে। তার জ্বালাতনে আপনিও একদিন ঘর ছাড়বেন।

সুমির ভাই বললেন, ডাক্তার বলেছেন, তার সঙ্গে ভালো আচরণ করলে অথবা ভালো জানে এমন কারো সঙ্গে দীর্ঘ দিন মিশতে পারলে সে ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু পাগলের কি কেউ বন্ধু হতে চায়। দিনে দিনে সুমি কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে।

সুমি বললো, তুমি প্রতিদিন আসবে আমাদের ঘরে। যদি না আসো তাহলে আমি ভাংচুর করবো, কাদবো।

বললাম, তুমি এখন ঘুমাও, আমি প্রতিদিন আসবো।

সত্যিই সুমি চলে গেল ঘুমাতে।

ভাবী-ভাইয়াকে সালাম দিয়ে চলে এলাম।

পরদিন সুমির সঙ্গে দেখা করলাম। এভাবে প্রতিদিন। সুমির পরিবর্তন হতে লাগলো। থেমে গেল কাপ পিরিচ ভাঙা, জোরে জোরে কাদা। সুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ভাবীর কাজকর্ম করে দেয়। কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব পাটে গেছে। সুমি আমাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে।

ভাইয়া ও ভাবী আমাদের মেলামেশাকে সহজভাবে মেনে নেন। উপলব্ধি করি, ভালোবাসার শক্তি কতো বেশি। ভালোবাসা পাটে দেয় পাগলের পাগলামি। গড়ে দেয় নতুন জীবন। আমি ও সুমি এখন বিয়ের অপেক্ষায় আছি। দোয়া করবেন, পাগলিকে নিয়ে যেন সুখী হতে পারি। আপনারাও সবাই প্রাণ খুলে ভালোবাসুন। দেখুন, ভালোবাসার শক্তি।

চৌমুহনী, ভোলা থেকে

হতভাগ্য স্বামী

অনন্যা

দাদা, আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। এই মাত্র আপনার লেখাটা (২০০৫-এর) মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। শুধু ২০০৫-এরটাই নয়, এর আগের সংখ্যাটাও পড়েছিলাম। জনপ্রিয় যায়যায়দিন পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা নিঃসন্দেহে মন-প্রাণ ছুঁয়ে যায় যেগুলো থেকে লাভ করা যায় বাস্তব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সব পাঠকই যার লেখক, সেই লেখকরা তাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে যা কারো কাছে প্রকাশ করা যায় না তা অবলীলায় প্রকাশ করে যাযাদি-তে।

দাদা, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মনের সুপ্ত ব্যথা যাযাদি-তে প্রকাশ করার জন্য, সবার সঙ্গে তা শেয়ার করার জন্য। ভেবেছিলাম এ পত্রিকায় যদি লিখি তাহলে নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখবো। এখন দেখছি সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার চেয়ে বরং আপনার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

আমি বয়সে আপনার চেয়ে অনেক ছোট হবো। চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিবেচনায় নিঃসন্দেহে আপনার চেয়ে অনেক নিচে অবস্থান করছি। কোনো এক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ-তে পড়ুয়া বিশ বছর বয়সী এক ছাত্রীর যুক্তি ও মতামতের মূল্যায়ন কতোটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা আমার জানা নেই। তবুও সীমিত জ্ঞানের এ পরিধিকে সম্বল করেই একজন মানুষ হিসেবে আরেকটা মানুষকে সঠিক, প্রাজ্ঞ ও বাস্তবসম্মত যুক্তির আলোকে নিয়ে যাওয়াকে মানবতা বোধ বলে মনে করছি। সে জন্যই আমার কলম ধরার এই প্রয়াস। দয়া করে আমার খণ্ডায়িত যুক্তিগুলো মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করার অনুরোধ করছি।

দাদা, প্রথমই প্রশ্ন রাখছি আপনার কাছে-ভেবে দেখুন, সত্যিই কি আপনি হতভাগ্য? এটা ঠিক, তিন বছর আগে ওই চিন্তা করাটা ছিল সঠিক। কিন্তু তিন বছর পর নিজেকে হতভাগ্য ভাবা কি নির্ভুল হচ্ছে? তাই যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে তা দূর করে সৌভাগ্যবান হওয়ার কি কোনো উপায় নেই? অবশ্যই আছে। ভেবে দেখুন।

হ্যাঁ, ঠিক আছে আপনার স্ত্রী অন্যায়ভাবে আপনাকে ঠকিয়েছে। নিজের ছেলে আর ভাতিজা একই সমতলে অবস্থান করে। পাগল না হলে সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ স্বেচ্ছায় এ ধরনের কাজ করবে না। ভাতিজার সঙ্গে এ ধরনের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে আপনাকে সীমাহীন কষ্ট দেয়া তার মোটেই ঠিক হয়নি। কিন্তু এটাও সত্যি,

অন্যায় করার জন্য সে খুব অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে শুধরে নিয়েছিল। এর আগের সংখ্যায় আপনি তা উল্লেখ করেছেন। তাহলে অনুশোচনা হবার পরও, নিজের ভুল বুঝতে পারার পরও তাকে চিরদিনের মতো নিজের মন থেকে ক্ষমা করতে আপনার এতো দ্বিধা কেন? হয়তো অত্যন্ত নির্মল নির্ভেজাল নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় স্ত্রীর এই অবৈধ, অমানবিক কঠোর বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। তাই তাকে ক্ষমাও করতে পারছেন না। কারণ আপনার অবচেতন মন সব সময়ই চেয়েছিল একজন সৎ ও বিশ্বস্ত জীবন সঙ্গিনী। সব স্বামীই এটা চায়। তেমনি সব মেয়েও চায় তার স্বামী রত্নটি দেহ ও মনের দিক দিয়ে পবিত্র হোক। আমিও চাই। এটাই স্বাভাবিক।

দাদা, আপনাকে এটাও ভাবতে হবে পৃথিবীতে স্বাভাবিকতার পাশাপাশি কিছু ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটে যা মেনে নেয়া কষ্টকর, তবুও মেনে নিতে হয়। ঠিক সে রকমটি ঘটেছে আপনার বেলায়। আপনাকেও মেনে নিতে হবে। বাধ্য হয়ে নয়, যুক্তির আলোকে। আপনাদের হিন্দু শাস্ত্রে কি আছে জানি না। কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রে আছে কেউ যদি তার কৃতকর্মের ফলে অনুতপ্ত হয়ে মন থেকে নিজেকে অপরাধী স্বীকার করে ক্ষমা চায় এবং আবার সেই কাজ না করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সর্বময় প্রজ্ঞাশীল, শক্তিমানও তাকে ক্ষমা করে কাছে টেনে নেন। আমরা সৃষ্টিকর্তার তুলনায় একেকজন মানুষ এতো নগণ্য হয়েও যেখানে স্বয়ং বিধাতা পাপী, অসৎ মানুষদের ক্ষমা করতে পারেন সেখানে আমাদের কি স্পর্ধা তাদের ক্ষমা না করার।

হয়তো ভাবছেন আমি মেয়ে হওয়ায় আপনার স্ত্রীকে সাপোর্ট করছি। মোটেই না। আমি চরিত্রহীনতাকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করি। কিন্তু এসব ব্যাপার যতোটা ঘৃণা করি তেমনি উদারতাও খুব পছন্দ করি। বিধাতার অনেক গুণের মধ্যে উদারতা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ যার মধ্যে শুধু কল্যাণই নিহিত। তার গুণে গুণান্বিত হলে সেখানে অকল্যাণ বলে কিছু থাকবে না। তাই আপনাকে বলছি, স্ত্রীকে ক্ষমা করে কাছে টেনে নিন। সেই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করুন তার হৃদয় থেকে যেন সব কালিমা ধুয়ে-মুছে যায়।

এবার আসা যাক আপনার ভাতিজার ব্যাপারে। আপনার মনে হচ্ছে তাকে খুন করলেই হয়তো ভালো হতো। আত্মিক তৃপ্তি পেতেন। এক ধরনের প্রতিশোধ নেয়া হতো। তাই না? ভেবে দেখুন সে ভয়ংকর রকম মূল্যহীন একটা অমানুষ যাকে শুধু করুণাই করা যায়। তার কথা বাদ দিন। এ ধরনের নুইসেন্স অমানুষকে নিয়ে ভাবা এক মুহূর্তও ঠিক নয়। তাকে খুন না করে এক ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন আপনি। কেননা যিনি তাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তিনিই সময় হলে শাস্তি দেবেন। আপনি যদি তাকে খুন করতেন তাহলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হতো বেশি। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আপনার স্ত্রীর ঘটনা জেনে যেতো। কেলেংকারি আরো বাড়তো। সবার বাকা দৃষ্টি আপনাদের জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলতো। আপনার সন্তানরা বড় হবার পর লোকমুখে নানা কথা শুনে তাদের জীবনে অনেক বড় ইফেক্ট পড়তো। আপনাদের দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা আর গ্লানি তাদের জীবনকে ব্যাহত করতো। অথচ খুন না করার কারণে এতো সমস্যা এবং অসুবিধা থেকে বেচে গেলেন।

সর্বোপরি মনে হচ্ছে আপনার প্রকৃত কষ্টটা এটাই, আপনার স্ত্রী একজন অসতী নারী যা আপনি বর্তমানে ধারণা করছেন বা ধরে নিচ্ছেন। তাই আপনার সুখের সংসারে দুঃখের অনল জ্বলছে।

দাদা, বলুন, আমাদের জীবনে কোন সময়টা বেশি তাৎপর্যময়? অতীত, বর্তমান, নাকি ভবিষ্যৎ? নিঃসন্দেহে অতীতের চেয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎই তাৎপর্যপূর্ণ এবং কাউন্টেবল। বোকারাই অতীত নিয়ে পড়ে থাকে। মানুষের শেষ অর্থাৎ ভবিষ্যতের পরিণাম এবং সর্বোপরি বর্তমান নিয়েই তাকে বিবেচনা করা হয়। একটা লোক অতীতে চোর ছিল। কিন্তু এক সময় নিজের ভুল, অন্যায় বোঝার পর চুরি করা ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে ভালো পথে ফিরে এসেছে এবং কখনো সে চোরাপথে যাবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে। এক্ষেত্রে তাকে যেমন তার অতীতের কার্যাবলীর কারণে চোর বলে ডাকা অন্যায় ঠিক তেমনি আপনার স্ত্রীও এক সময় ভুল পথে ছিল, এখন সে শুদ্ধ পথেই রয়েছে। তাহলে তাকেও অসতী বলে ডাকা নিতান্তই অন্যায় হবে। তবে হ্যাঁ, যে শুধরানোর কথা বলছি সেটা সত্যিকারভাবেই খাটি ও নির্ভেজাল হতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে আপনার স্ত্রীও আগের মতোই স্বচ্ছ ও পবিত্র হতে বাধ্য।

চিন্তা করে দেখুন, মা-বাবা আর সন্তানের পর এ পৃথিবীতে আপনার স্ত্রীই হচ্ছে আপনজন। সে ভ্রান্ত পথে ছিল। কিন্তু এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, সে তা বুঝতে পেরেছে। এ জ্ঞানটুকু দেবীতে হলেও তার মধ্যে ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়েছে। স্বামী হিসেবে আপনি তাকে পবিত্রতা দিয়ে, বিশুদ্ধতা দিয়ে আরো বুঝিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসুন। এটা আপনার কর্তব্য। অনুতপ্ত হয়ে সে তো দেবীতে পরিণত হয়েই গেছে। বাকিটা ডিপেন্ড করছে আপনার ওপর। আপনিই বলেছিলেন, **Purity can come from impure water, if you boil it's character.**

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। যায়যায়দিন-এর পাঠকের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য আশীর্বাদ রইলো, আপনারা যেন সুখী হতে পারেন। সুখে থাকার অভিনয় নয়, সত্যিকারভাবেই যেন সুখের স্বর্গ রচনা করতে পারেন। ঠিক ২০০৪ সালের যাযাদির ৫৫ পৃষ্ঠার স্বামী গল্পের দম্পতির মতো। এমন সুন্দর কাহিনী, ক্ষমাশীলতার অপূর্ব ঘটনা খুব কমই পড়েছি। আপনাকেও পড়তে বলছি। নিজের স্নেহময় ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে নিজের প্রেমিকাকে নতুন করে অঙ্গুরী রূপে সাজিয়ে তোলা উদারতা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

প্রতিটি সংসারেই এ রকম উদারমনা স্বামী থাকা উচিত আর প্রত্যেক স্বামীরও এমন জীবন সঙ্গিনী হওয়া উচিত যে তাকে বুঝবে, অকারণে কষ্ট বা ব্যথা দেবে না। যদি ভুলক্রমে মনের অজান্তে দিয়েও ফেলে তাহলে যেন নিজেকে শুধরে সেটা পুষিয়ে দিয়ে স্বামীকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেয়। তাহলে আমার বিশ্বাস, যেসব ফ্যামিলিতে স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ত্রুটি থাকে তা সহজেই দূর করে প্রকৃত সুখী হওয়া সম্ভব।

ঢাকা থেকে

তুলি

মোহাম্মদ আলী

ভোরে মোবাইল ফোন বেজে উঠায় ঘুম ভাঙলো। বিরক্ত হয়ে ফোন রিসিভ করি। হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে বড় আপুর কণ্ঠস্বর। আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললো, তোর দুলাভাই আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টার ফ্লাইটে দেশে আসছে, নামবে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট। তুই চলে আয়।

কি আর করা, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ঢাকা থেকে সোজা চট্টগ্রামের উদ্দেশে ট্রেনে চেপে বসলাম। যথাসময়ে এয়ারপোর্টে হাজির। দুলাভাইকে নিয়ে তাদের বাড়ি এলাম।

দুলাভাইয়ের আসার খবর পেয়ে কিছু নিকট আত্মীয় বাড়িতে এসে ভরে গেল। বাড়িতেও কেমন যেন একটা খুশির আমেজ বইছে।

দুলাভাই ও আপুসহ তাদের রুমে বসে গল্প করছি। কথায় কথায় দুলাভাই বললো, কি হে শালা দিনকাল কেমন যাচ্ছে?

প্রশ্নের উত্তর না দিতেই একটি মধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, দিনকাল তো ভালোই যাচ্ছে, এখন ব্যবস্থা করলে হয়।

আমি হতবাক। সামনের দিকে তাকাতেই আমার চোখ দুটো আটকে গেল – ডানাকাটা পরী সামনে দাড়িয়ে আছে।

টানা হরিণী চোখ, লম্বা চুল, সব মিলিয়ে যেন এক রূপের দেবী। বিধাতা যেন নিজ হাতে গড়েছেন!

অপূর্ব ভালো লাগায় মেয়েটির মধ্যে হারিয়ে গেলাম। জানি না কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম।

আপুর ধাক্কায় সশ্বিৎ ফিরে পেলাম। ততোক্ষণে মেয়েটি মুচকি হেসে চলে গেল।

আপুকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি কে?

তার নাম তুলি, আমাদের আত্মীয়। ব্যস ওটুকুই।

মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য মনটা কেমন যেন ছটফট করছিল, তাই দেবি না করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম কি?

নাম দিয়ে কি কাম আর মেয়েদের দেখলে এতো নাম জানার ইচ্ছা হয় কেন?

ওরে বাবা, এ তো দেখছি ঝগড়াটে মেয়ে। দেখুন, আপনার পরিচয় ঠিক জানি না তাই জানতে চাচ্ছি।

ছোট ভাগিটা এসে বললো, মামা, ওর নাম তুলি।

এবার হলো তো।

না হয়নি, আরো কিছু প্রয়োজন আছে। আচ্ছা ভালো লাগা কি অপরাধ? সে কিছু না বলে ঠোটের কোণে এক চিলতে বাকা হাসি দিয়ে চলে গেল। রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারলাম না। অথচ জীবনে কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাইনি।

বিশটি ভ্যালেন্টাইনস ডে জীবন থেকে হারিয়ে গেল, ভালোবাসা বলতে জীবনে কিছুই আসেনি। তাছাড়া আমি এসবের বিরোধী ছিলাম।

বন্ধুদের রীতিমতো উপদেশ দিতাম, ভালোবাসা জীবনকে দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। ক্ষণিকের আবেগে না জড়ানোই ভালো। এতে জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়।

ফলাফল হিসেবে বন্ধুরা সব সময় বলতো, তুই শালা আস্ত একটা ইয়ে...। তাদের অপবাদ মেনে নিতাম।

বন্ধু জামালকে বললাম, সত্যিই তুলিকে ভালোবেসে ফেলেছি।

দোস্ত, তোর মাথা ঠিক আছে তো?

পুরোপুরি সুস্থ মাথায় বলছি।

ছুটি না থাকায় কর্মস্থলে ফিরে এলাম। কিন্তু কাজে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না।

একদিন অফিশিয়াল কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন এলো। রিসিভ করার পর অপর প্রান্ত থেকে একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বললাম, কাকে চাচ্ছেন?

আপনাকে।

বিরক্ত হয়ে ফোনের লাইন কেটে কাজে ব্যস্ত হলাম। রাতে আবার ফোন এলো। বললাম, কেন ডিস্টার্ব করছেন, কে আপনি?

আত্মার আত্মীয়।

চমকে উঠলাম, তাহলে কি তুলি! জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

ভালো। কেমন করে বুঝলেন আমি আপনাকে ফোন করেছি?

আত্মার আত্মীয়কে তো হৃদয় দিয়েই অনুভব করতে হয়।

আর মনের মানুষকে?

সে তো হৃদয়ের গভীরে থাকে।

তাহলে মশাই মনের মানুষটা কে?

এখনো আসেনি তবে প্রতীক্ষায় আছি।

সে দিনের ব্যবহারের জন্য আপনার কাছে দুঃখিত, তাছাড়া দেখছিলাম, আপনি কি বলেন।

ও, তাই বুঝি। এখন থেকে আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করবেন আপনি।

মনে মনে ভাবলাম মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। বললাম, কোন অধিকারে?

মনের মানুষকে তুমি করে বলতে কি অধিকার লাগে? তাছাড়া আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়।

ঠিক আছে।

এভাবে আমরা আরো কাছে আসি। আমাদের ভালোবাসার কথা হতো ফোনে। দেখা হতো বন্ধুর বাসায়, নদীর পাড়ে।

কিছুদিন পর ছুটি নিয়ে বাড়িতে যাই। আমাদের ধামে চলাচলের সুবিধার্থে বেশির ভাগ মানুষ বাইসাইকেল ব্যবহার করে। বাইসাইকেল নিয়ে আপুদের বাড়িতে গেলাম। সাইকেল তাদের উঠানে রেখে আপুর সঙ্গে কথা বলছি। হঠাৎ সাইকেল পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম।

আপু বললো, দেখতো কি হলো। গিয়ে দেখি তুলি ও তার তিন বান্ধবী বাইসাইকেল চালানোর চেষ্টা করছে। সাইকেল থেকে পড়ে তুলির এক বান্ধবীর পা কেটেছে।

বললাম, এই যে ম্যাডাম, আমি কি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি?

ধমকের সুরে বললো, জ্বি না সাহেব।

অনুমতি ছাড়া কারো জিনিস ধরা অপরাধ।

অবশ্যই অপরাধ। অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত আপনার, আমাদের নয়!

মানে?

মানে সহজ। আপনি এখানে সাইকেল রাখতে আমার বান্ধবী পা কেটে ফেলেছে। অতএব, অপরাধের শাস্তি পেতে হবে আপনাকে।

এখন কি করতে হবে।

শাস্তি হিসেবে আপনাকে পুকুরে নামতে হবে।

তখন ছিল পৌষ মাস, পৌষের হাড় কাপানো শীত।

ঠিক আছে যেহেতু মহিলাদের ক্ষমতা বেশি হুকুম তো মানতেই হয়।

বুদ্ধি করে বললাম, আমার একটা শর্ত আছে। আমি সাতার জানি না। আমাকে পানির পরিমাণটা দেখিয়ে দিতে হবে। শর্তে তারা রাজি হলো।

আমি পুকুরের পানির কাছে দাড়ালাম। তুলি তার বান্ধবীদের ফিশফিশ করে বললো, বেচারা পানিতে নামলে ঠাণ্ডায় একেবারে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, নামানোর প্রয়োজন নেই।

আরেক বান্ধবী বললো, দেখা যাক প্রেমের মরা জলে ভাসে কি না আর গাধার কি শীত আছে?

এ কথাগুলো শুনিye বললো, আমি না শোনার ভান করলাম।

তারা তিনজন পুকুর পাড়ে আর একজন নিচে এসে বললো, এ পাশে পানি কম। বলে উপরে উঠে যাবে এমন সময় পেছন থেকে টান দিয়ে পানিতে ফেলে দিলাম।

উপরে উঠে বললাম, একজনের জন্য গর্ত করলে সে গর্তে নিজের পড়তে হয় – এটা নিশ্চয় জানা আছে? বলে চলে আসি।

কিছুক্ষণ পর দেখি তুলির বান্ধবী শীতে কাপছে।

কাপা কাপা গলায় বললো, আপনি পরীক্ষায় পাস করেছেন।

তুলিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

আমার বান্ধবীরা তোমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিল।

এ রকম আরো অনেক দুষ্টমি করতো তুলির বান্ধবীরা।

একদিন তুলি ফোন করে বললো, আজ চারটায় কলেজের পুকুর পাড়ে এসো, আমরা নদীর পাড়ে ঘুরতে যাবো।

বললাম, ঠিক আছে।

কলেজের পুকুর পাড়ে আসতে প্রায় পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেল। এসে দেখি তুলি মুখ গোমড়া করে দাড়িয়ে আছে।

বললাম, কখন এসেছো?

তোমার এই আসার সময় হলো?

বাড়িতে একটু সমস্যা হয়েছিল তাই দেরি হয়েছে।

আমি কোথাও যেতে বললেই তোমার সমস্যা হয়ে যায়, তাই না?

আচ্ছা ঠিক আছে আর কখনো এমন হবে না।

রিকশা ডাকো। বাধ্য ছেলের মতো রিকশা ডেকে আনলাম।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

জাহান্নামে।

তুমি থাকলে যেতে রাজি আছি।

নদীর পাড়ে দুজনে বসে কথা বলছি।

বললাম, তোমার কানে কানে ছোট একটা কথা আছে।

কি কথা?

শুনবে কি না বলো।

আচ্ছা ঠিক আছে বলো।

তুলির কানের কাছে মুখটা নিয়ে তার লজ্জা রাঙা ঠোটে একটা চুমুর পরশ দিলাম।

সে বললো, দুষ্ট, অসভ্য।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।

আমার বুকে মাথা রেখে বললো, আমার ভয় হয় তোমার জন্য।

কেন?

তোমাকে যদি কখনো হারিয়ে ফেলি।

পাগলি!

আচ্ছা ধরো আমাদের ভালোবাসার কথা যদি ফ্যামিলিতে জেনে যায় তখন কি হবে?

ফ্যামিলি যদি না মেনে নেয় তাহলে পালিয়ে বিয়ে করবো।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি আসি। ঈদের পরের দিন তুলির বান্ধবীর বাসায় তুলির সঙ্গে দেখা করতে যাই। ঈদের দিন কেন আসিনি সে জন্য সে কি অভিমান।

ব্যস্ততার জন্য আসতে পারিনি বলার পর শান্ত হলো। সে সালাম করার জন্য মাথা নিচু করলো।

বললাম, কি করছো?

কেন ঈদের সালাম করছি।

মুখে করলে কি হয় না?

মনের মানুষকে পায়ে ধরে সালাম করতে হয়।

সে মিনতি করলো, আজ বাধা দিও না, আমার এতোটুকু চাওয়া পূরণ করতে দাও।

সে জড়িয়ে ধরে বললো, কতো দিন পর এলে...।

দুষ্টমি করে বললাম, কালই ঢাকায় ফিরে যেতে হবে। একথা শুনে সে একটা গান ধরলো, সম্ভবত রুনা লায়লার গাওয়া গান— চলে যেও নাকো কিছুক্ষণ থাকো... থাকো কিছুক্ষণ।

তুলিকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। ঈদের আনন্দ দুজনে ভাগ করে উপভোগ করলাম।

আমাদের ভালোবাসার দিনগুলো কাটছিল হাসি আর আনন্দে।

যে ভেলায় চড়ে সুখের স্বপ্ন দেখতাম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতাম, একদিন ভালোবাসার ভেলাটি পড়ে গেল দুঃখের অথৈই সাগরে। আমাদের ফ্যামিলিতে জানাজানি হলো ভালোবাসার কথা।

তুলির ফ্যামিলি থেকে কড়াকড়িভাবে বলা হলো, আমাকে ভুলে যেতে।

আমার ফ্যামিলিতে সমস্যা হলো একদিকে আত্মীয়তা, দ্বিতীয়ত এ মেয়েকে আমার মা-বাবা ছেলের বৌ হিসেবে কখনো মেনে নেবেন না।

তুলির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল, তবে ফোনে কথা হয়।

একদিন তুলির এক বান্ধবীর সাহায্য নিই। বেড়ানোর নাম করে তুলিকে তার বাসায় নিয়ে আসি। সেখানে আমাদের দেখা হয়।

দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর তুলি আমাকে ধরে কেদে ফেলে। সে আমাকে নিয়ে সর্বক্ষণ চিন্তা করে।

বললাম, চলো আমরা পালিয়ে বিয়ে করি।

এতে তুলির বান্ধবীরা বললো, হিতে বিপরীত হবে। অপেক্ষা করো, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার বন্ধুদেরও একই মতামত। বললাম, এছাড়া আর কোনো পথ দেখছি না।

তুলিকে বললাম, আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা করো না। অপেক্ষায় থাকো। একদিন তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবো।

বাড়িতে যাওয়া হয় না অনেক দিন হলো। জানি না তুলি কেমন আছে। সারা দিন নিজেকে কর্মব্যস্ততার মাঝে ডুবিয়ে রাখি কষ্টগুলো ভুলে থাকতে। যখনই একা হই বা রাতে ঘুমাতে যাই তুলির কোমল মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তুলিকে দূরে রেখে মনে হয় বড় একা, এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।

জামালকে মাঝে মধ্যে চিঠি লিখি। জামাল উত্তরে আমাকে সান্ত্বনা দেয়, দোস্ত তুই শুধু অপেক্ষা কর, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

জানি না হয়তো তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে সবার অজান্তে কোনো এক নতুন জীবনে ফিরে যাবো...। সেখানে হবে আমাদের পবিত্র ভালোবাসার মিলন।

মুছাপুর, সন্দ্বীপ থেকে

সুখে থেকে

মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন

ডিগ্রি পরীক্ষা শেষ করে বাড়িতে এসেছি। বেশ কয়েকদিন এলাকায় ঘোরাফেরা করে সময় কাটিয়ে দিছি। এতোদিন কলেজ হস্টেলে থেকে যে আনন্দ উপভোগ করতাম তারচেয়ে বহুগুণ আনন্দ কিংবা ভালো লাগছে আমার গ্রাম, পরিচিত রাস্তাঘাট ইত্যাদি। দুপুরে মায়ের হাতের রান্না করা চিংড়ি ভুনা দিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমাতে যাবো ঠিক এ সময় পাশের বাড়ির সম্পর্কে চাচি এসে হাজির। মাকে বললেন, ভাবী শুনলাম আপনার ছেলে এসেছে।

মা বললেন, হ্যাঁ, এই তো কয়েকদিন হলো এসেছে।

চাচি বললেন, সে এখন কোথায়?

মা বলে দিলেন, তার রুমেই হয়তো আছে। মায়ের কথামতো চাচি রুমে এসে আমাকে বললেন, কেমন আছো বাবা?

বললাম, জি চাচিআম্মা, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?

বললেন, ভালো আছি, তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

বললাম, ভালো হয়েছে, দোয়া করবেন যেন ভালো রেজাল্ট করতে পারি। জবাবে চাচি বললেন, কি যে বলো বাবা সন্তানদের জন্য মায়ের দোয়া সব সময়ই থাকে। বাবা তোমাকে একটি কথা বলতে এসেছি।

বললাম, বলেন না কি বলবেন।

বলছিলাম, তুমি এখন অবসর, তোমার ছোট বোন লাইলিকে যদি একটু পড়াতে তাহলে ভালো হতো। যতোদিন পড়াবে আমি তোমাকে মাসে এক হাজার টাকা করে দেবো। বললাম, চাচিআম্মা আমি তো কোনোদিন টিউশনি করিনি। তাছাড়া কাউকে পড়াতে আমার ভালো লাগে না। এরই মধ্যে মা এসে বললেন, যতোদিন থাকিস একটু পড়া। অবশেষে দুইজনের কথা রাখতে গিয়ে রাজি হয়ে বললাম, পড়াবো কিন্তু কোনো টাকা পয়সা নিতে পারবো না। তারা দুজনই বললেন, ঠিক আছে।

কথামতো পরদিন লাইলিদের বাড়িতে গেলাম, লাইলিকে দেখে রীতিমতো আমি অবাক। চার পাচ বছর আগের লাইলি আর এখনকার লাইলি রাত আর দিন। লাইলি আমাকে বললো, কি ব্যাপার স্যার কোনো কথা বলছেন না যে। চা খাবেন না?

অবশ্যই চা খাবো। লাইলি তুমি কোন ক্লাসে পড়ছো বলতেই বলে উঠলো, কেন আমি কোন ক্লাসে পড়লে আপনি খুশি হতেন? কথা শুনে আমার মনে হয়েছে তার সঙ্গে যেন প্রতিদিনই কথা হতো, কেমন একটা বগড়ার ভাব। লাইলিকে আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে দেখেছিলাম একদিন স্কুলে যেতে। তাদের বাড়ির একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মেয়েটি কে? জবাবে বলেছিল, এটা তোর নজরুল কাকার মেয়ে।

সম্ভবত তখন ক্লাস সিঙ্গ-এ পড়তো। তারপর কয়েকদিন তাদের বাড়িতে গেলে তার সঙ্গে দেখা হলে খুব লজ্জা পেতো, কাছে আসতো না।

কিন্তু আজ লাইলির কথাবার্তায় মনে হয় তার আগের লজ্জাগুলো এখন কেটে গেছে।

বললাম, লাইলি আমি তোমার টিচার। প্রশ্ন করেছিলাম তুমি কোন ক্লাসে পড়ো। কিন্তু তুমি?

ও সরি স্যার, ভুল হয়ে গেছে, আমি ক্লাস টেন-এ পড়ি। চা খাওয়া শেষে বললাম, তাহলে আজ আসি কাল থেকে তোমাকে পড়াবো, বলতেই বললো, কেন আজ পড়াবেন না। বললাম, না কাল থেকে।

পরদিন গেলাম পড়াতে। তার পড়ার রুমটা খুব চমৎকারভাবে সাজানো। একটা গভীর ভাব আছে রুমটায়। খুবই ভালো লাগছিল রুমটা। বললাম, লাইলি তুমি কি পড়বে আমার কাছে। আমি তো আর সব সাবজেক্ট পড়াতে পারবো না। তোমার ইচ্ছামতো যে কোনো দুটি বেছে নিতে পারো। লাইলি বললো, আপনাকে সব বিষয় পড়াতে হবে, যদি সব না পড়ান তাহলে চলে যেতে পারেন। শেষের কথাটা একটু খারাপ লাগলো আমার। ভাবলাম, কেমন মেয়েকে পড়াতে এলাম। ঠিক আছে কি কি পড়বে বলো। এরই মধ্যে চানাশতা এসে গেছে। খাচ্ছি আর অংক করাচ্ছি। তখনি বলে উঠলো স্যার, হয় খান না হয় পড়ান। তার কথায় একটু লজ্জাই পেলাম। ভাবছি এতো বান্ধবীর মধ্যে তার চরিত্র কোথাও খুঁজে পাইনি আমি। বললাম, ঠিক আছে খাবো না পড়াবো।

এভাবে প্রায় মাসখানেকেরও বেশি সময় চলে গেল। এমন একটি দিন বাকি ছিল না যেদিন সে দুষ্টমি করতো না। কিন্তু খোজ নিয়ে জেনেছি, সবাই বলেছে লাইলি খুব শান্ত এবং ভদ্র মেয়ে। মাথা নিচু করে চলাফেরা করে। বুঝলাম, আমার সঙ্গে দুষ্টমি করতে হয়তো ভালো লাগে। তাই কিছুই বলি না। কিন্তু মাঝে মধ্যে এমন সব কথা বলে মনে হয়, সে আমাকে ছাড়া বাচবে না। মনে মনে ভাবছি মেয়েটি আমাকে খুব ভালোবাসে হয়তো। কিন্তু সে তো জানে রুবিনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। জানার পর কেন লাইলি এমন করছে বুঝতে পারিনি।

একদিন লাইলিকে পড়াচ্ছি আমার মনটাও তেমন ভালো ছিল না। পড়ার মাঝে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। লাইলির পড়ার রুমে আর কেউ নেই। বিদ্যুৎ যাওয়ার পর বললাম, লাইলি হারিকেন কোথায়। লাইলি জানি না বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। চুমু দিতে দিতে বললো, এমন বোকা পুরুষ আর আছে কি না জানি না। যে পুরুষ চোখের ভাষা বোঝে না, একটি মেয়ে কি চায় তা জানে না। উঠতি বয়সের একটি মেয়ের স্পর্শে আমি একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। তার চোঁটের স্পর্শে আমার শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম আমি এ কি করতে যাচ্ছি। তার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বললাম, আমি সবই বুঝি, এখন থাক এগুলো পড়ে হবে। আমি জানি তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো, আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি। এখন হারিকেন জ্বালাও বলতেই লাইলি বললো, না হারিকেনের পরিবর্তে আজ আপনাকেই জ্বালাবো। অবস্থা খারাপ দেখে একটু জোরেই তাকে ধাক্কা দিয়ে আমি চলে এলাম। বাড়িতে এসে মাকে বললাম, মা কালই কুমিল্লায় চলে যাবো। সেখানে কাজ আছে, সেই কাজটা করতেই সময় কেটে যাবে। তাছাড়া এখন একটা চাকরিও তো করতে হবে। এভাবে তো আর বসে থাকলে চলবে না। মা বললেন, এখন চাকরির প্রয়োজন নেই। আগে মাস্টার্স কমপ্লিট করো তারপর। বললাম, ঠিক আছে কাল আমি কুমিল্লায় চলে যাবো। সেখানে কমপিউটারটা তো শেখা যাবে। মা বললেন, ঠিক আছে তাহলে যা। পরদিন লাইলিদের বাড়িতে গিয়ে লাইলির মাকে বললাম, চাচিআম্মা আমার বিশেষ একটি কাজে আজই কুমিল্লা চলে যেতে হবে, তাই লাইলিকে আর পড়াতে পারবো না। লাইলির মা বললেন, ঠিক আছে বাবা যাও তবে তাড়াতাড়ি চলে এসো।

লাইলিকে বললাম, লাইলি আমি চলে যাবো। তুমি অন্য কোনো টিচারের কাছে পড়ো।

লাইলি আমাকে বললো, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। যদি তোমাকে আমি না পাই তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো। আমি অনেক বছর ধরে তোমাকে হৃদয়ে লালন করছি। তুমি আমার অনেকদিনের ভালোবাসার ফসল।

বললাম, লাইলি এমন কিছু নিয়ে কল্পনা করো না যা তোমাকে কষ্ট দেবে। তুমি তো জানো আমি রুবিনাকে বিয়ে করবো। আমাদের কথাবার্তা ফাইনাল।

বললো, তোমার বিয়ের দিনই আমার লাশ দেখতে পাবে।

পাগলামি করো না লাইলি। সব কিছু বুঝতে শেখো বলে চলে এলাম।

তারপর রুবিনাকে ঘটনাটা খুলে বলে আমি কুমিল্লায় চলে গেলাম।

কিন্তু লাইলি প্রতিটি ঈদে কিংবা বিশেষ দিনে আমাকে কার্ড দিয়ে উইশ করে। মাঝে মাঝে এমন কিছু চিঠি পাই যা আমার পড়তে খুবই ভালো লাগে। চিঠি পড়ে ভাবি, মানুষ মানুষকে এভাবে ভালোবাসে। কিন্তু রুবিনাকে আমি খুব ভালোবাসি। সে তো কোনোদিন এমন একটি চিঠি লিখলো না। লাইলির চিঠিগুলো যদি আমি না পেতাম তাহলে বুঝতাম না ভালোবাসা কাকে বলে। আমি এর জবাব দিই না ইচ্ছা করেই। এভাবে প্রায় দুই বছর কেটে গেল। বিভিন্ন কারণে আমি চলে এলাম প্রবাসে। প্রবাসে আসার ছয় মাসের মাথায় জানতে পারলাম লাইলির বিয়ে হয়ে গেছে। শুনে নিজেকে কিছুটা মুক্ত মনে হলো। কিন্তু তারপরও লাইলি বিশেষ দিনে আমাকে উইশ করতে ভুলে না। লাইলির উইশ করা কার্ডগুলো আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলতো। এর কিছুদিন পরই শুনে পেলাম রুবিনা অন্য এক ছেলের হাত ধরে চুপিসারে কোর্ট ম্যারেজ করেছে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে। বললাম, এটাই নিয়তি। আহত মন আরো আহত হতে লাগলো। গত ভালোবাসা দিবসে ব্যতিক্রমধর্মী একটি শুভেচ্ছা কার্ড পেলাম লাইলির। খুবই সুন্দর দেখতে কার্ডটি। দীর্ঘক্ষণ কার্ডটি দেখেছি। সঙ্গে ছোট একটি চিরকুট –*যার কারণে তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিলে, সে কি তোমাকে কাছে টেনে নিয়েছে। তুমি যদি চাও তাহলে*

পড়ে ভাবছিলাম তা কি করে সম্ভব। কার্ডটি পেয়েছিলাম ভালোবাসা দিবসের দুইদিন আগে। ভালোবাসা দিবসে বেশ কয়েকটি এসএমএস করলাম লাইলিকে। লাইলিও এর জবাব দিল। লাইলি আমার মোবাইল নাম্বার পেয়ে প্রতিদিনই ফোন করতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে নাম্বারটা পরিবর্তন করে ফেললাম। কারণ লাইলি এখন অন্যের স্ত্রী। সুখে থাকো লাইলি ও রুবিনা।

রিয়াদ, সউদি আরব

E-mail : nbbillal@hotmail.com

বন্ধুর বাসা

হানিফ খান জয়

তখন আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী। কোচিং করার জন্য থানা শহর ভালুকায় আসি। কোচিংয়ে আমার অনেক বন্ধু ছিল। কিন্তু কোনো বান্ধবী ছিল না। তাই সব সময় একজন মিশুক, আনন্দমণ্ডা, প্রাণবন্ত ও রসিক বান্ধবীর অভাব বোধ করতাম।

কিছু দিন পর একজনকে বিধাতা আমার জীবনে পাঠিয়েছিলেন, যে আমার বান্ধবী থেকে সম্প্রতি জীবনসঙ্গীতে পরিণত হতে যাচ্ছে।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এভাবে : আমি একটি বাসায় ভাড়া থাকতাম। আমাদের কোচিংয়ের এক বন্ধুর বাসায় মেয়েটি পরিবারসহ ভাড়া থাকতো। তার নাম ছিল শ্রাবন্তী (ছদ্মনাম)। বন্ধুর বাসায় যাতায়াতের ফলে প্রায়ই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হতো। চোখে চোখ রাখতাম।

এ রকম চোখাচোখি হলে সে লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিতো। বন্ধুর বাসার কাজের মহিলা আমাদের দেখে ফেলে। তিনি আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

কাজের মহিলাকে খালা বলে ডাকতাম। তিনি খুব রসিক ও মজার লোক ছিলেন। খালার সঙ্গে শ্রাবন্তীর বেশ খাতির ছিল।

খালার সঙ্গে আমারও বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। একদিন খালাকে বললাম, শ্রাবস্তীর কাছে একটা চিঠি লিখতে চাই। সেই চিঠি গ্রহণ ও উত্তর দিতে শ্রাবস্তী রাজি আছে কি না একটু জেনে আসবেন। খালা বললেন, ঠিক আছে।

পরদিন খালা আমাকে বললেন, সে রাজি হয়েছে। আমি তো খুশিতে দিশেহারা। এতোটুকু অনুমতি শ্রাবস্তীর কাছ থেকে পেয়ে মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে আমার মতো সুখী পৃথিবীতে কেউ আছে কি? এ খবর পেয়ে সারাটা দিন যে কিভাবে পার হলো তা জানি না। রাতে পড়া শেষে গদ্য ও পদ্যের মিশেল দিয়ে বিশাল এক প্রেমপত্র লিখলাম। তারপর সকালে খালা এলে তাকে দিয়ে প্রেমপত্র পাঠালাম।

খালা চিঠি দিয়ে ফিরে এসে যা বললেন, তাতে আমার মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

শ্রাবস্তী চিঠিটি হাতে পাওয়ার পর এক নিঃশ্বাসে পড়ে ছিড়ে বাসার আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দিয়েছিল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে খালাকে বলেছিল, এতোটুকু পিচ্চি ছেলে, লিখতে পারে না। আবার প্রেম করতে চায়। শখ তো কম না!

খালার মুখে এটা শোনার পর আমার জেদ আরো বেড়ে গেল। মনে মনে বলেছিলাম, শোনো মেয়ে, তোমাকে ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি নই। তোমার অহংকার ধুলায় মিশিয়ে দেবো।

পরীক্ষার কয়েক দিন আগে শ্রাবস্তীকে দেখলাম বন্ধুর রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হাতের ইশারায় তাকে ডাকলাম। ভেবেছিলাম আসবে না।

কিন্তু দেখলাম সে আমার দিকে আসছে। ধুক ধুক করে কাপতে লাগলো আমার বুক। নিজেকে তার সামনে বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল। বন্ধুর রুমে এসে সে বললো, আপনি কি আমায় ডেকেছেন?

জি।

কেন ডেকেছেন?

আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

সে বললো, কতো সময় লাগবে?

এই পাচ মিনিট।

বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, এতো সময়?

আপনি ব্যস্ত থাকলে প্রয়োজন নেই। শেষ পর্যন্ত সে রাজি হলো।

তখন ছিল গোপুলি লগ্ন। আধো আলো আধো অন্ধকার। বললাম, বসেন। সে বসলে আমি পাশাপাশি বসতে চেষ্টা করলাম। যতোই তার পাশে বসতে চেষ্টা করি সে ততোই দূরত্ব বাড়ায়। এক পর্যায়ে জোর করেই তার পাশে বসলাম। বললাম, আপনার হাতটা আমাকে দিন। সে হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

তার হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো। এতোটুকু সময়ের মধ্যে তাকে তুমি বলতে শুরু করি।

সে বললো, পরীক্ষার পর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো।

না, এখনই বলতে হবে। সে কিছুই না বলে চুপচাপ নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলো। আস্তে করে তার মুখে হাত দিলাম এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঠোটে একটি চুমু একে দিলাম। সে উঠে দাড়িয়ে বললো, অসভ্য ছেলে, ছোটলোক, মেয়েদের চুমু খেতে লজ্জা করে না?

বোকার মতো দাড়িয়ে তার কথাগুলো হজম করছিলাম। সে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে গেল। ততোক্ষণে আমার বন্ধু শ্যামল (এটাও ছদ্মনাম) পাশের রুম থেকে এসে বললো, কি হয়েছে?

বললাম, কিছু না। সে তখন রেগে শ্রাবস্তীদের বাসার দিকে যেতে চাচ্ছিল। শ্যামলকে ডেকে অনুরোধ করাতো সে শান্ত হলো। সে দিন শ্যামলের আন্মা বাসায় না থাকায় বেচে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম শ্রাবস্তী হয়তো তার বাবাকে দিয়ে শ্যামলের মায়ের কাছে নালিশ করবে। কিন্তু সে তা করলো না।

ভেবেছিলাম এর পর থেকে আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করবে। রাতে খালার বাসায় গিয়ে আমি ও শ্যামল সব কিছু খুলে বললাম। শ্রাবস্তীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের ভুল স্বীকার করে চিঠি লিখলাম।

ভেবেছিলাম উত্তর দেবে না। কিন্তু পর দিন দেখলাম কোচিং শেষে সে গেটের পাশে একা দাড়িয়ে আছে। আমি ও শ্যামল যখন শ্রাবস্তীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন শ্যামলকে ডাক দিয়ে বলে, এই চিরকুটটি জয়কে দেবে। তারপর সে আমাদের অনেক আগে বাসায় চলে যায়। আমরা শ্যামলের রুমে গিয়ে চিরকুটটি খুলে দেখি, লেখা -

শুনুন, আপনি যদি আমাকে সত্যিই ভালোবেসে থাকেন তাহলে আমিও আপনাকে ভালোবাসি। আপনি আমাদের বাসায় বেড়াতে আসবেন।

ইতি

শ্রাবস্তী

সামান্য একটু লেখা মনে হয় সারা দিনে হাজার বার পড়েছি। বার বার পকেটে রাখতাম আর খুলে খুলে পড়তাম। এ চিঠি পাওয়ার দুই দিন পর তাদের বাসায় ঢুকলাম। দেখি সে উল্টো দিকে করে বসে পিঠে রোদ লাগিয়ে ইংরেজি পপি গাইড পড়ছে। বাতাসে উড়ছে তার এলোমেলো চুলগুলো। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে চুলের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। তারপর হারিয়ে গিয়েছিলাম গানের রাজ্যে। দ্বিজেন মুখার্জির একটি গান মনে পড়ছিল তখন।

শ্যামল বরণ ওগো কন্যা

এই ঝিরি ঝিরি বাতাসে ওড়াও ওড়না

মেঘের আলোক দোলায় কোথা যাও

কতো হাসির ফোয়ারা তোমার ঝরনা।

হঠাৎ তাকে ডাকলাম। আমাদের দেখে সে লাফ দিয়ে উঠে বললো, আরে আপনারা! ভেতরে আসেন।

ভেতরে গেলাম। শ্রাবস্তীর মা বেচে না থাকায় তার ছোট ভাই পলাশের কান্না থামাতে সে পাশের রুমে গেল। তার ভাইকে নিয়ে এসে খাটে বসিয়ে আমাদের বিস্কিট খেতে দিল। আমরা একটি করে বিস্কিট খেয়ে বাকিগুলো পলাশকে দিয়ে বলি, ভাইয়া আমাদের বাসায় চলো। তখন শ্রাবস্তী চুপচাপ খাটের কোনায় বসে আছে। নীরব থাকার কথা জানতে চাইলে বলে, আপনি পরীক্ষার আগে আর আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না। কারণ জানতে চাইলে বলে, সে নাকি লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। তাই পরীক্ষার আগে আর তেমন কিছু হলো না।

পরীক্ষা শেষ হলো দুদিন আগে। নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে তাদের বাসায় গেলাম। যাওয়ার পর যা শুনি তা আমার জন্য খুব দুঃখজনক। শ্রাবস্তী জানালো, তারা দুই দিন পর শেরপুর চলে যাচ্ছে বাবার ট্রান্সফারের জন্য। তার বাবা বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থায় চাকরি করেন, আর মা পলাশকে জন্ম দেয়ার সময় মারা গেছেন।

ট্রান্সফারের দুঃখজনক খবর শুনে তার দিকে তাকিয়ে দেখি একটা কাগজ হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছে। কাগজটি আমাকে দিয়ে বলে, আমি চিরদিন আপনার অপেক্ষায় থাকবো। নতুন বাসার ঠিকানা লেখা কাগজটি নিয়ে চলে আসি। তারপর তারা চলে যায় শেরপুর।

পরীক্ষার রেজাল্ট হয়। দুজনই ভালোভাবে পাস করি। স্বাভাবিক যোগাযোগ রাখি মোবাইলের মাধ্যমে।

আমি মাস্টার্স করে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করছি। শ্রাবস্তী অনার্স ফেল করায় আর লেখাপড়া করেনি। আমার পরিবার থেকে তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তার বাবা বিয়েতে রাজি। সুতরাং আমাদের বিয়েটা হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই।

সোয়াইল, ভালুকা থেকে

কষ্টের মাঝে তুমি

তমা রানী

করতোয়া বিনোদন, দেশের একটি জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। করতোয়া বিনোদনেরই একটি বিভাগ কলম বন্ধু। কলম বন্ধু-র মাধ্যমেই অমলের সঙ্গে আমার পরিচয়, প্রেম। অমল ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে অ্যাকাউন্টিং-এ অনার্স পড়তো। দুজনে খুব ভালো বন্ধু হবো, এ কারণেই অমলকে আমার লেখা।

প্রস্তাবটা অমলের পক্ষ থেকেই প্রথম আসে। আমি প্রথমে রাজি হইনি। কারণ আমি ছেলেদের বিশ্বাস করতাম না। তাছাড়া অমলকে কতোটুকুই বা চিনি। সে নিজ থেকে যেটুকু বলেছে সেটুকুই। এটুকু পরিচয়ে আর যাহোক, কাউকে ভালোবাসা যায় না। অমলের এ রকম প্রস্তাবে খুব অবাক হই! তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অচেনা, অজানা একটি মেয়েকে তার ভালো-মন্দ কোনো কিছু না জেনে ভালোবেসে ফেলার ব্যাপারটা আমার কাছে সত্যি অবিশ্বাস্য মনে হলো। তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাইলো না।

অমল খুব সুন্দর চিঠি লিখতো। তাছাড়া কারো চিঠি পাওয়ার মধ্যে যে অন্য রকম এক ফিলিংস তা অমলের চিঠি পেয়েই প্রথম বুঝলাম। তাই চাইতাম অমল আমাকে লিখুক। যখন তার ভালোবাসাকে সুকৌশলে এড়িয়ে চললাম, তখন অমল আমার ওপর অভিমান করে অনেক কষ্টের কথা জানিয়ে তার ভালোবাসার করুণ আর্তি জানালো। তার কথাগুলো আমাকে খুব আহত করলো। যদিও তখনো অমলের প্রতি আমার সে রকম কোনো দুর্বলতা ছিল না, তবুও লিখে জানালাম ভালোবাসার কথা।

এভাবে চললো কিছু দিন। আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে গেল। অমল চিঠিতে জানালো আমার পরীক্ষা দেখতে আসবে। তাই এক কপি ছবিসহ ঠিকানা চেয়েছে। আমি চাইতাম আমাদের প্রথম দেখা সরাসরি হবে, সে কারণে ছবি দিতে চাইতাম না। অমলের আরেকটি চিঠি পেলাম, চিঠিতে ব্যাকুলতা জানিয়ে লিখেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলেও ক্ষতি নেই, দূর থেকে ভালোবাসার মানুষটিকে শুধু একটিবার দেখবো।

সেদিন তার এ চাওয়ার মধ্যে হয়তো এমন কিছু ছিল যার জন্য না করতে পারিনি। তাছাড়া ভাবলাম অমলকে আমার জানতে হলে, বুঝতে হলে তার কাছাকাছি আসতে হবে। জানতে হবে সে আমাকে সত্যিই ভালোবাসে কি না? এ কারণে তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা জরুরি। তাই ছবিসহ বিস্তারিত ঠিকানা লিখে জানালাম।

অমলের আসার কথা শুনে নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কেন জানি তাকে নিয়ে ভাবতে খুব ভালো লাগতো।

এর আগে তাকে নিয়ে কখনো ভাবিনি। পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকি, পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে তাকে নিয়েই ভাবতাম। কবে অমলের সঙ্গে দেখা হবে এ প্রত্যাশাই সময় কাটতো।

বুঝলাম, আমি পাস করতে পারবো না। কারণ পড়াশোনায় মন বসে না। সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম, অমলকে ভালোবেসে ফেলেছি। এতো দিনের বিশ্বাস, অহংকার এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ভাবলাম তার সঙ্গে দেখা হলে সব বলবো।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলো সেই দিন। তারিখটা আমার এখনো মনে আছে। কারণ এদিনেই, আমার কষ্টের বীজগুলো বপন করেছিলাম। তাই তো এ দিনটির কথা কখনো ভুলতে পারি না। সারা রাত তার ভাবনায় ঘুম হলো না। সকালে যখন কলেজে যাবার জন্য রেডি হচ্ছি কেন জানি ভয়ে আমার বুকটা কাপছে। যতোই সময় ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততোই ভয়ে আমার বুক কাপতে লাগলো। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে অমলের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তার উপস্থিতিতে ভয়টা আরো বেড়েই চললো। তবুও মনে শক্তি সঞ্চয় করলাম। অমলের সঙ্গে কোনো কথা হলো না, সব কথা তার বন্ধুই বললো। সময় না থাকায় বললাম, পরীক্ষা শেষ হলে কথা হবে।

কিন্তু নিয়তি সেটা চাইলো না। আমার সঙ্গে সিমন থাকায় কথা বলতে পারলাম না। সিমন আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। আমরা প্রাইমারি, হাই স্কুল, কলেজে এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বন্ধুত্বটা ঘনিষ্ঠই ছিল। সিমন পড়াশোনায় বরাবরই ভালো। অমলের কথা সিমনকে বলতে পারিনি, কারণ আমি ছিলাম প্রেম-ভালোবাসার চরম বিরোধী। সিমন যদি জানতো কারো প্রেমে পড়েছি তাহলে আমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়তো।

পরীক্ষা শেষ হলে সিমনকে বললাম, তুই বাসায় যা আমরা একটু পরে যাবো।

সিমন বললো, না। আমার সঙ্গে যেতে হবে।

প্লিজ সিমন, তুই যা না। আমাদের একটু কাজ আছে।

কি কাজ আছে বলো। আমি তোদের সঙ্গে গেলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

আমরা দুই বান্ধবী যখন খুব পীড়াপীড়ি শুরু করলাম, তখন সিমন বললো, ঘটনা কি? তোরা দুজনে আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছিস না? কোনো বদ মতলব নেই তো? তবে মতলব যাই থাকুক তোদের না নিয়ে যাচ্ছি না। হাজার হোক আমি তোদের লোকাল গার্ডিয়ান। তোদের ছেড়ে যাই কি করে?

ধরা পড়ার ভয়ে আর কিছু না বলে রিকশায় উঠলাম। যখন রিকশায় উঠলাম, কেনো জানি মনটা কিছুতেই যেতে চাইছে না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হলো আমার বুকটা ছিড়ে কেউ কলিজাটা জোর করে টেনে হেচড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। অমলের প্রতি কোথায় যেন একটা টান অনুভব করলাম। তখন বুকের ভেতর যে কি হচ্ছিল তা শুধু আমিই জানি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে সিমন বললো, ছেলেটি কে?

আমি আতকে উঠলাম! বললাম, কোন ছেলেটি?

সিমন বললো, দ্যাখ আমার চোখকে ফাকি দেয়া অতো সহজ নয়। আমি বুঝতে পেরেছি সেই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলার জন্যই তোরা দুজনে আমার সঙ্গে আসতে চাচ্ছিলি না।

একটু রেগে বললাম, বুঝেছিস যখন, তাহলে আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে এলি কেন?

তুই আমাকে বলিসনি কেন? দ্বিতীয় কারণ আমি একটু মজা দেখছিলাম।

আমি এবার রিকশাওয়ালাকে দাড়াতে বললাম। রিকশা থেকে নেমে সিমনকে বললাম, তুই এবার রিকশায় বসে মজা দ্যাখ, আমি চললাম।

অমল যেখানে দাড়িয়ে ছিল আবার সেখানেই গেলাম। কিন্তু অমলকে আর পেলাম না। আশাহত হয়ে ফিরে এলাম। বাসায় এসে কিছুই ভালো লাগছিল না। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো। বিছানায় শুয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছিলাম।

মা বললেন, কিরে কি হয়েছে? কাদছিস কেন?

মায়ের কথায় আরো জোরে কাদতে লাগলাম। অনেক কষ্টে মা আমাকে শান্ত করলেন। তারপর মাকে সব বললাম।

মা বললেন, ছেলেটাকে বাসায় নিয়ে এলি না কেন?

ভয়ে, তুমি যদি আমাকে ভুল বোঝ?

অমলের কথা এর আগে একবার মাকে বলেছিলাম। মা যে ব্যাপারটা এতো সহজভাবে নেবেন ভাবতে পারিনি।

সেদিন মা আমাকে বলেছিলেন, ছেলেটি যদি তোকে সত্যি ভালোবাসে তাহলে তোর ওপর অভিমান করে থাকতে পারবে না। আর যদি তোকে ভুল বোঝে তাহলে জানবি ছেলেটি তোকে ভালোবাসে না।

মায়ের কথাগুলো আমার বুক কাটার মতো বিধলো।

বললাম, প্লিজ মা, এভাবে বলো না। অমল আমাকে সত্যি ভালোবাসে।

সেদিন রাতে ঘুমোতে পারলাম না। মাথার মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো। সারারাত অসংখ্য ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুললো। মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, অমল আমাকে ক্ষমা করবে তো? একটা অপরাধবোধ সারা রাত আমাকে তাড়া করলো। পরের দিন ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলাম।

অবশেষে মায়ের কথাই সত্যি হলো। অমল আমাকে ভুল বুঝে চলে গেল। দূরে। অনেক দূরে। আমি জানতাম অমল আর কোনো দিন লিখবে না, তবুও তার চিঠির অপেক্ষায় থাকতাম। যতোই দিন যায় অমলের প্রতি উৎকণ্ঠা ততোই বাড়তে থাকে। এরপর ঠিক মতো খেতে ইচ্ছে করতো না, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করতো না, বাইরেও খুব একটা যেতাম না। আগের মতো হাসতাম না, সারাক্ষণ মনমরা হয়ে ঘরে শুয়ে থাকতাম। কাজ-কর্ম কিছু করতাম না। মা বকাবকি করতেন, কান দিতাম না। অমল আমার সব ভাবনাকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে রাখলো। বুঝলাম, অমলকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। তাকে ছাড়া আমার চলবে না। আমার এ অস্বাভাবিক আচরণে মা খুব বিস্মিত হলেন। আমাকে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করতেন। আমি নিরুত্তর থাকতাম।

এভাবে কেটে গেল কয়েক মাস। এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অমলকে ভালোবাসি জানতাম কিন্তু তাকে এতো বেশি ভালোবাসি তা অমলকে হারিয়ে বুঝলাম।

মা জোর করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। আমি যেতে চাইতাম না। কারণ কেউ না জানুক আমি জানি, আমার কি হয়েছে। ভাবলাম মৃত্যুই আমার মুক্তির পথ। মৃত্যুই আমাকে সব দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারবে। এছাড়া আমার মুক্তি নেই।

ডাক্তার পরীক্ষা করে কোনো রোগ ধরতে পারলেন না। মা খুব চিন্তায় পড়লেন।

মাকে বললাম, কিছু ভেবো না, আমার কিছু হয়নি। রোগ না থাকলে ডাক্তার রোগ ধরবে কি করে? এভাবে কেটে গেল আরো কয়েক মাস।

ক্রমে আমার অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়লো। আমাকে ঢাকায় মামার বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো চিকিৎসার জন্য। সিমন তখন ঢাকায় থাকতো। প্রতিদিন একবার ক্লিনিকে আমাকে দেখতে আসতো। বুঝতে পারলাম আমার পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। ভাবতে লাগলাম আমার মা, বোন ও ভাইয়ের কথা। আমার অপরাধের শাস্তি তারা কেন পাবে? আমার জন্য তারা নিঃশ্বাস নিয়ে যাবে। তাই সিমনকে একদিন সব বললাম— যে কথাগুলো আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে পারিনি। এমনকি আমার সবচেয়ে প্রিয়, কাছের মানুষ মাকেও না। কারণ বড় মুখ করে তার কথা মাকে বলেছিলাম, অমল আমাকে মায়ের কাছেও ছোট করে দিয়েছে।

সেদিনের পর সিমন আমাকে আর দেখতে আসে না। ভাবলাম অসুখ করলো না তো? দশ দিন পর সিমন এলো। দেখলাম, সিমন শুকিয়ে গেছে, মনে হলো কতো দিন কিছু খায়নি, ঘুমায়নি, রাত জেগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম,

কিরে শরীর খারাপ? তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

সিমন আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো।

আবার বললাম, কিছু বলছিস না যে? আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখেছিস, চেহারাটার কি হাল করেছিস?

সিমন এবার নিস্তব্ধতা ভেঙে বললো, এ কয়দিন তোকে নিয়ে খুব ভেবেছি। আমার কেবলই মনে হয়েছে তোর আজকের এ পরিণতির জন্য আমিই দায়ী। আমার জন্যই অমল তোকে ভুল বুঝেছে। বিশ্বাস কর, নিজেকে আমার খুব অপরাধী লাগছে।

সিমনের কথায় বুকের ভেতর জমে থাকা ক্ষতটাতে যেন আবার নতুন করে রক্তক্ষরণ শুরু হলো। তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো সে ভাষাও আমার জানা ছিল না। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। হ হ করে কেদে ফেললাম।

সিমন আমার হাত দুটো ধরে বললো, প্লিজ তুই আমাকে কথা দে, তুই ভালো হবি। তোর নিজের জন্য না হোক আমার জন্য তোকে সুস্থ হতে হবে। আল্লাহ না করুক, তোর যদি একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না।

প্লিজ সিমন, এভাবে বলিস না। তোর কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তোর কাছে আমার অনুরোধ, তুই কখনোই নিজেকে অপরাধী ভাববি না। তাহলে খুব কষ্ট পাবো। আর আমি কষ্ট পাই এটা নিশ্চয়ই তুই চাস না।

শুধুমাত্র সিমনকে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম সুস্থ হওয়ার জন্য। তারপর সিমনের অক্লান্ত সেবা, ডাক্তারের চিকিৎসা সবকিছু মিলে দীর্ঘ সাত মাস পর সুস্থ হলাম।

এখানেই শেষ নয়। আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম। ডিগ্রি পরীক্ষাও দিলাম। পরীক্ষার পর আবার বেড়াতে গেলাম ঢাকায়। ঢাকায় সিমন, আমি ও বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে অনেক মজা করে ঘুরলাম। চিড়িয়াখানা, বোটানিকাল গার্ডেন, সংসদ ভবন, নন্দন পার্ক, শিশু পার্ক, ফ্যান্টাসি কিংডম, স্মৃতিসৌধ – সব দেখলাম। দুই মাস পর বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফেরার পাচ দিন পর মোবাইলে খবর পেলাম সিমন চিরদিনের মতো এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আবার নতুন করে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। সৃষ্টিকর্তা এতো নিষ্ঠুর কেন? আমি মৃত্যুর কাছে গিয়েও ফিরে এলাম অথচ সুস্থ, সুন্দর মানুষটাকে কি অবলীলায় তার প্রিয়জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আজকাল সিমনের কথা খুব বেশি মনে পড়ে। সেই ছোট বেলা থেকে এক সঙ্গে বড় হয়েছি, পড়াশোনা করেছি। স্কুল, কলেজের কতো কথা, কতো স্মৃতি।

সিমন ডায়েরি লিখতো। ডায়েরিতে লিখেছে আমি তার বেস্ট ফ্রেন্ড। অথচ কোনো দিন আমাকে তা বলেনি। আমার প্রতি তার যে এতো সুন্দর একটা ধারণা আছে ঘৃণাক্ষরেও জানতে পারিনি। ডায়েরিতে লিখেছে, তুই এতো ভালো কেন রে? জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি কিন্তু তোর মতো এতো ভালো, পবিত্র আর বিশাল মনের মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখিনি। তোর মতো মেয়ের জন্য এতো ভালো ছেলে কোথায় পাবো? অমল সত্যি ভাগ্যবান, তোর মতো একটা পবিত্র মেয়ের ভালোবাসা পেয়েছে। আরো অনেক কথা লিখেছে। তার মতো এতো ভালো বন্ধু আমি কখনো পাবো না, কখনো না।

অমল, জানি না এ লেখাটা চোখে পড়বে কি না? ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে। আপনার মনে আছে আমাকে অনেকগুলো কবিতার শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন? সেদিন আপনার চিঠিটা দেয়তে পাওয়ায় আমার অনুভূতির কথাগুলো বলতে পারিনি। আজ দীর্ঘ চার বছর ছয় মাস সাত দিন পূর্ণ হলো, আপনি ভুল বুঝে চলে গেছেন। তবুও আপনাকে একটি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি। এতো বছরেও আপনার প্রতি ভালোবাসা এতোটুকু ম্লান হয়নি। আজও আগের মতোই ভালোবাসি। জানি না কোথায়, কতো দূরে কোন স্বর্গসুখে কাটছে আপনার দিনগুলো। এতো দিনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছেন? তবে আমার মতো করে আপনাকে কেউ কখনো চাইবে না, ভালোবাসবে না। আপনি সেদিন আমার কাছে মুক্তি চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু আমি নিজেকে কেন আপনার কাছ থেকে মুক্ত করতে পারিনি বলতে পারেন? মুক্তি দিলেই বুঝি মুক্ত হওয়া যায় না? তাই বুঝি আজও আপনাকে ভালোবেসে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি প্রতিটি মুহূর্তে। জানি, এ পবিত্র ভালোবাসার কোনো মূল্যই আপনার কাছে নেই। তারপরও আপনাকেই ভালোবাসি, ভালোবেসে যাবো আজীবন।

আমি দেখতে সুন্দর নই তবুও অনেকেই পছন্দ করে, ভালোবাসে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার মন্তব্য সুন্দর ব্যবহারের জন্যই নাকি আমাকে সবাই পছন্দ করে। অমল, আমার জীবনে অনেকেই আসতে চেয়েছে কিন্তু এতো কিছু পর আর কাউকে কখনো ভালোবাসতে পারিনি, পারবোও না কোনোদিন। শখের বসেই গান শিখেছিলাম। একদিন এক ফাংশনে গান গাইতে গিয়ে সেখানে এক প্রাইমারি শিক্ষক আমাকে পছন্দ করেন। দু পক্ষেরই পছন্দ। ছেলে সরকারি চাকরি করে, এমন পাত্র হাতছাড়া করতে মা কিছুতেই রাজি নন। তার ওপর আমি ডিগ্রি পাস করলে হাই স্কুলে ঢুকিয়ে দেবে।

ডিগ্রি পরীক্ষায় আমি শুধু ইংরেজিতে ফেল করি। এবার ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েছি। এতো দিন পরীক্ষার কথা বলে বিয়েটা এড়িয়ে চলেছি। বিয়েতে মত না থাকলেও মাকে কিছুই বলতে পারছি না। কি করে বলবো, মাকে তো কম কষ্ট দিইনি। হয়তো তার মুখের দিকে তাকিয়ে না করতে পারবো না। আজ আমি কতো অসহায়!

কিন্তু এভাবে কি সুখী হতে পারবো, না পারবো কাউকে সুখী করতে? জানি না স্বামী নামের সেই পুরুষটিকে কোন মন-মানসিকতায় গ্রহণ করবো। তাকে কি ভালোবাসতে পারবো কোনো দিন? সারা জীবন হয়তো প্রতারণা করে যাবো। আর ভাবতে পারছি না অমল। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিয়তি বোধহয় আমার কপালে দুঃখ ছাড়া কিছুই লেখেননি। তাই তো এক দুঃখের সাগর থেকে আরেক দুঃখের সাগরে ফেলার চূড়ান্ত আয়োজন চলছে। জানি না, সামনে আর কতো কষ্টের সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে।

বেলাইচণ্ডি থেকে

স্বার্থ-নিঃস্বার্থ

লাভলী

ভালোবাসা শব্দটির ক্ষমতা দুনিয়া জুড়ে। জীবনের সর্বস্তরেই এর নিভৃত পদচারণা। এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার ক্ষমতা এ জগতে কারোরই নেই। আল্লাহর সৃষ্টি এ ধরনী ভালোবাসার টানেই গড়া। মানুষ একা থাকে না, থাকতে পারে না। আদম (আ.) একা বেহেশতে অস্বস্তিতে ছিলেন অন্য কারো সান্নিধ্যের জন্য। এই একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য আল্লাহ হাওয়া (আ.)-কে পাঠালেন সঙ্গী হিসেবে। কতো চমৎকার ভালোবাসার এই বন্ধন সারা পৃথিবীতে!

একের জন্য অন্যের অভাব বোধ করা, আকর্ষণ, মায়া-মমতা ভালো লাগার পথ ধরেই নীরবে স্থান করে ভালোবাসা। এ ভালোবাসার জন্য কতো কান্নাকাটি, কতো আত্মদান, কতো সুখ, বৈভব বিসর্জন, কতো হা-হতাশ, কতো টানাটানি, কতো কাড়াকাড়ি, গল্প, কথা, সুর-ছন্দ সেই সৃষ্টি থেকে চলে আসছে। চলবে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত। তবুও কেন জানি মনে হয় ভালোবাসার মূল্য আজ আর আগের মতো নেই।

জগতে সৃষ্টির সেরা জীব আমরা মানুষ। সারা দুনিয়ার মানুষের মাঝে আজ মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে পশুত্ব জেগে উঠছে। ভালোবাসা হারিয়ে গিয়ে নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা প্রভাব বিস্তার করছে। তাই সারা দুনিয়ায় খুন-খারাবি, মারামারি, ধর-কাটো-মারো, জ্বালাও-পোড়াও সর্বস্তরে বিরাজ করছে।

আফগানিস্তান আর ইরাকের কতো অগণিত নিরপরাধ মানুষ ধ্বংস হয়ে গেল। আজো যাচ্ছে। তথাকথিত মানুষরূপী পশুদের ভেতর কি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে? ভালোবাসা আছে? দয়ামায়া আছে?

প্রেমিক স্বামী খুন করছে তার প্রেমিকা স্ত্রীকে। ভাই খুন করছে বোনকে। অতি সাধারণ একটা ঘটনা নিয়ে একে অন্যকে খুন করছে। পত্রিকার পাতার প্রতিদিনের চিত্র সত্যিই মনটাকে বড় বেশি ভারাক্রান্ত করে ফেলে। অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা, সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ক্ষমতার লোভ, সমাজ-সংসারের ভালো লাগা, ভালোবাসাগুলোকে প্রতিনিয়ত গলা টিপে হত্যা করছে। এ জন্যই মানুষ হতাশ হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে।

এ মুহূর্তে প্রতিটি মানুষের মাঝে দয়ামায়া, ভালোবাসা গড়ে ওঠা অতি বেশি প্রয়োজন। একের প্রতি অন্যের আন্তরিকতা ভালোবাসাই অন্যকে করে তুলবে ধৈর্যশীল, স্থিতিশীল, নমনীয়, আন্তরিক যা থেকে তৈরি হবে জীবন-সংসারে শান্তি, সুখ, ভালোবাসা। সবার প্রতি সবার অনেক ভালোবাসা প্রয়োজন।

এখানে দেখি প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মা-বাবা একে অন্যকে খুবই ভালোবাসে। মা সন্তানকে, সন্তান মাকে চুমু খাচ্ছে। প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে চুমু খাচ্ছে। পথেঘাটে, বাস-স্টেশনে গলা জড়িয়ে, কোমর প্যাচিয়ে হাটছে। কতো আদর, কতো ঘনিষ্ঠতা, কতো ভালোবাসা এদের

পথে পথে! দেখলে মনে হয় সত্যিকার সব ভালোবাসা বুঝি এদের মাঝেই বাসা বেধে রয়েছে। অন্তরের অন্তস্তলে স্থায়ী ঘাটি গেড়েছে।

দীর্ঘ ইউরোপিয়ান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি সব ভুল, সব মিথ্যা, সব ঠুনকো কাচের চুড়ির মতো। সামান্য ছুতো-নাভায় একের হৃদয় থেকে অন্যের ভালোবাসা মুছে যায় চিরতরে। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। একে অন্যকে ফেলে দূরে বহুদূরে চলে যায়। যৌবনে একের স্থান অন্যকে দিয়ে এরা দ্রুত-অতিদ্রুত খুব সহজে পুষিয়ে নেয়। এদের হৃদয়ের গভীরতা, অন্তস্তল বলে কিছু আছে বলে মোটেও মনে হয় না।

ইটালিতে দীর্ঘ সময় বসবাস এবং একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ক্যাশে চাকরি করার সুবাদে অনেক ইটালিয়ানের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আমার কর্মস্থলের শুরুর দিকে পরিচয় ফাবিও-মনিকা, লরেঞ্জে-জর্জা, মারিও-আন্নার সঙ্গে। তিন কপিয়া আলাদা আসতো। তবে কোনো কপিয়া কোনো কাপিয়ার পরিচিত নয়। আমি ক্লায়েন্ট হিসেবে অনেকের মতো চিনি এবং একটু বেশি কথাবার্তা হয় তাদের সঙ্গে। সব সময়ই লক্ষ্য করেছি যখন দুজনের যেকোনো কাপিয়াই আসে গলা জড়িয়ে, না হয় কোমর জড়িয়ে চুম্বকের মতো একে অপরের সঙ্গে লেগে থাকে। প্রতি সেকেন্ডে চুমু দিচ্ছে। একে অপরকে আদর করে দিচ্ছে গালে হাত দিয়ে। মাথায় হাত বুলিয়ে। আমি দেখি, বাঙালি নারী হয়ে লজ্জা পাই আবার এতো ভালোবাসা দেখে ঈর্ষান্বিত হই। ভাবি, আহা! কতো ভালোবাসা এদের! এরপর আস্তে আস্তে এক জোড়া, কিছুদিন পর দুই জোড়া, এরও পর তিন জোড়ার প্রতিটি একা একা আসছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

একদিন ফাবিও নিজ থেকে বললো, সে আর মনিকা এক সঙ্গে থাকে না। ক্রমান্বয়ে জানতে পারলাম সবার লিভ টুগেদার ভালোবাসার সমাপ্তি হয়েছে। সবাই যার যার মতো একা থাকছে। আরো কিছুদিন পর দেখি নতুন সঙ্গী জুটিয়ে আবার আগের মতো ভালোবাসার স্রোত বইয়ে তারা আবার সুখের দোলায় দুলছে। হৃদয়ে কোনো আচড় লাগেনি, ক্ষত হয়নি, কেউ দেবদাসও হয়নি। কেউ পার্বতীও না। এমনকি হা-হতাশ করেনি। এটাই তাদের ভালোবাসার স্বাভাবিকতা।

যৌবন গেল এভাবে। বার্ষিকের কথা তো না লিখে পারা যায় না। যৌবনে সঙ্গীর বদলে সঙ্গী খুঁজে নিলেও বার্ষিক্যে কুকুরকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় অনেকেই। কুকুর-বিড়ালই একাকীত্বের যন্ত্রণায় মলমের প্রলেপ দেয় তাদের ভাষায়। এ রকম বেশ কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে জানার সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে একজন সিনোরা পেলমেরিনি।

আমার কর্মস্থল, আমার বাসা এবং সিনোরা পেলমেরিনির বাসা খুবই কাছাকাছি। সত্তরোর্ধ সিনোরা পেলমেরিনি তার ফ্ল্যাটে থাকেন একা, নিঃসঙ্গ। স্বামী বিশ বছর আগে গত হয়েছেন। দুই ছেলেমেয়ে আগে রোমে থাকতো। এখন যে যার মতো বিয়ে করে রোমের বাইরে থাকে। কুকুর-বিড়াল পুষে তিনি ঘরবাড়ি নোংরা করার পক্ষপাতী নন। সে কারণেই তাকে আমার ভালো লাগে। তার বাসায় সময় পেলে যাই। সুখ-দুঃখের গল্প শুনি। আমি গেলে সে খুব খুশি হয়। পেনশনের টাকায় তার খরচ চলে। ছেলেমেয়েরা মন চাইলে কিছু দেয় আবার দেয় না। এ রকমই চলছে। দিন দিন বুড়ো হয়ে যাওয়া, অসুস্থ হয়ে পড়া।

তিনি যৌবনে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, ছবি দেখেছি। এ বয়সেও রূপসী। স্বামী হারিয়ে তিনি বন্ধু খোজেননি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন আদর, সোহাগ, ভালোবাসা দিয়ে। ছেলেমেয়েরা আঠারো বছর মায়ের ভালোবাসায় ডুবে ছিল। মাকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়েছে, চুমু খেয়েছে। ধীরে ধীরে মা-সন্তানের নাড়ির বাধন ছিন্ন করে চলে যায় দূর থেকে দূরে, বহুদূরে। বছরে দুই একবার এসে মাকে দেখে যায়।

সিনোরা পেলমেরিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকেন। দুই তিনবার বিভিন্ন কারণে অপারেশনও করেছেন। ছেলেমেয়েরা ফোনে খবর নেয়, দেখে যায়। হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় এলে বিকেলে ধীরে ধীরে বের হন। আমার এখানে আসেন। আমি গেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। একাকীত্বের যন্ত্রণা প্রকাশ করেন। অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ি তার কথা শুনে।

বাজার করা, বিল দেয়া, পেনশন তোলা সব নিজেই করতে হয়। কাজের লোক রেখে পেনশন থেকে বেতন দিতে পারবেন না বলে একাই সব করেন। সিনোরা পেলমেরিনি ভারাক্রান্ত হয়ে বলেন, কি লাভ সংসার-সন্তান এসব করে। এতো আদর, মায়া, মমতা, ভালোবাসা কেন হারিয়ে যায়? বৃদ্ধ বয়সে আমরা কতো অসহায়!

একদিন হয়তো মরে পড়ে থাকবো কেউ জানবে না। সন্তানরা এসে বাড়ি বেচে টাকা নিয়ে চলে যাবে। বৃদ্ধ মা-বাবাকে সন্তানরা কাছে রেখে আদর, ভালোবাসা না-ই দিল, সেবায়ত্ন না-ই করলো। তবে মড়াকে মাটি দেয়ার জন্য সন্তানের কিই বা প্রয়োজন!

সিনোরা পেলমেরিনির চোখের পানি দেখে আমার বুক ফেটে যায়। হু হু করে আমিও কেদে উঠি। চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে আমার মা জননীর মুখ। যার পায়ের নিচে আমার বেহেশত। আমিও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মাকে ফেলে দূরে থাকি। তবে এদের মতো নয়। প্রায় প্রতিদিনই মায়ের সঙ্গে কথা বলি, খোজখবর নিই। কি লাগবে না লাগবে খেয়াল রাখি। নামাজ পড়ে আমার মায়ের শতায়ু কামনা করি। দেশে ভাইবোনরাও মাকে মাথায় করে রাখার চেষ্টায় ব্রত। আমার প্রাণপ্রিয় বাবা হারানোর ব্যথা মায়ের মাঝে ভুলে থাকতে চাই। মা হারালে তো আর মা পাবো না।

একজন মা কতো কষ্ট করে দশ মাস সন্তানকে পেটে নিয়ে চলাফেরা করেন, জন্ম দেন। শিশুকালে বুকো আগলে রাখেন, মানুষ করেন আর সেই মাকে আমরা বড় হয়ে অবজ্ঞা, অবহেলা, অনাদর, অযত্ন করবো, দূরে ফেলে দেবো এ অন্যায়। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবে না। বাবা-মাকে কষ্ট দানকারীদের আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এর শাস্তি আমাদের দুনিয়াতেই ভোগ করতে হবে।

আসুন আমরা সবাই বেশি করে মা-বাবাকে ভালোবাসি। যারা আমাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছেন, আমরাও তাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে তাদের শেষ জীবন পরিপূর্ণ করে তুলি পরম তৃপ্তিতে। জগতের সব মা-বাবা সন্তান নিয়ে সুখী হোন। সন্তান এবং মা-বাবার ভালোবাসা জগতে শ্রেষ্ঠ এবং সত্যিকার ভালোবাসা হোক।

রোম, ইটালি থেকে

ভাইয়া

আরিফ

যার কথা লিখতে গিয়ে বুক ভেঙে যাচ্ছে, কলমের কালি চোখের পানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে- সে একই সঙ্গে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু, ভাই, শিক্ষক ও অভিভাবক। যার ওপর ডিপেন্ড করি।

আমাদের বয়সের ব্যবধান বেশি নয়। একই সঙ্গে বেড়ে উঠি। বাড়ে রাগ, অভিমান, ঝগড়া-কলহ। রাগ উঠলে কখনো ভাইয়ার বই ছিড়ে ফেলতাম, মারামারি করতাম, কিন্তু কখনো মারামারিতে হারতাম না। এখন বুঝি, প্রতিদিনই হেরেছি ভাইয়ার ভালোবাসার কাছে, স্নেহের কাছে।

সারা দিন এটা সেটা নিয়ে ঝগড়া করলেও কোনো দিন তৃতীয় পক্ষ এসে আমাকে মারতে পারতো না। কখনো শাসন করে আশু মারতে এলে ভাইয়া আমাকে নির্দোষ দেখিয়ে তিনি দোষী সাজতেন। এতো ঝগড়া করতাম, তারপরও ভাইয়া কোথাও বেড়াতে গেলে খেলার সামগ্রী আমাকে দিয়ে যেতেন।

ফুটবল খেলতে গিয়ে কেউ পায়ে ব্যথা দিলে অথবা কোনো খেলায় কেউ আমায় আঘাত করলে ভাইয়া এর প্রতিশোধ নিতেন, কোনো ক্ষেত্রে খেলা থেকে বাদ দিয়ে দিতেন।

আমরা দুই ভাই প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে বাবার কবর জিয়ারত করতে যেতাম।

একদিন ভাইয়া বললেন, আরিফ, তুমি বিএনপি করবে, কারণ বাবা বিএনপির সেবক ছিলেন। সেই থেকে আমি বিএনপির সমর্থক। ভাই মোহাম্মেডানে খেলতেন। দেখতাম আমার যে গান পছন্দ, তিনিও সে গান পছন্দ করেন। আবার ভাইয়া যার ফ্যান, আমিও তার ফ্যান। এভাবেই ভালোবাসার ভিতটা আমাদের অজান্তে গড়ে উঠতে থাকে। এ ভিত কত যে শক্ত আর মজবুত, তা পদে পদে টের পাই।

আজ যখন শুতে যাই আর মশা তামাশা করে, তখন মনে পড়ে বাড়িতে থাকতে ভাইয়া মশারি টাঙিয়ে মশারির ভেতরের মশা মেরে চলে যেতেন আর আমি জেগেও ঘুমের ভান করে থাকতাম।

খেতে বসলে মনে পড়ে যায় সিনার হাড়টা আমার পাতেই আসতো ভাইয়ার মাধ্যমে। আর বলতেন, তুমি অনেক পড়ালেখা করো, তোমার ভালো খাওয়া চাই।

ভাইয়া এইচএসসি পাস করে সংসারের হাল ধরেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ লিখেছিলেন, ভালোবাসার মানুষের কাছে মনে মনে চিঠি লিখলে মনের মানুষ তা পড়তে পারে। আমার যখন মুক্তি দেখতে বা অন্য কিছু মন চায়, তা ভাইয়াও বুঝতে পারেন। কোনো সমস্যা বা অপরাধ করলে বুঝে ফেলেন, তার সমাধানও করেন।

মেস লাইফে কতো বন্ধু আছে, আছে তাদের ভালোবাসা। কিন্তু ভাইয়ার ভালোবাসার কাছে সবই ম্লান। ঢাকা শহরে একজন অনার্স পড়ুয়া ছাত্রের পড়াশোনা করার যাবতীয় খরচ যখন ভাইয়ার কাছ থেকে আনতে যাই তখন মনে পড়ে যায়, আমার জমানো টাকা ভাইয়া নিলে আমি প্রচণ্ড রাগ করতাম।

একজন মানুষ তার ছোটভাইকে কতো ভালোবাসতে পারে তা আমার শরিফভাইয়াকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

কথায় আছে, *মাছের শত্রু চাই (ফাদ) ভাইয়ের শত্রু ভাই*। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

আমার বর্তমান ভাবিকে ভাইয়ার বিয়ের সময় পাত্রী হিসেবে কেউ পছন্দ করেনি। শুধু আমি পছন্দ করেছিলাম বলে ভাইয়া ভাবিকে বিয়ে করেন। ভাবীর সঙ্গে আমার বন্ধুর মতো সম্পর্ক। ভাবীও আমাকে ভাইয়ের মতোই আদর করেন।

লোকে বলে, *ভাই বড় ধন রক্তের বাধন, যদি ছিল হই নারীরই কারণ*। ভাইয়ার জীবনে যে নারী এসেছে তা আমাদের সম্পর্ককে আরো মজবুতই করেছে।

আমি চাই, আমার জীবনেও এমন নারী আসবে যে ভাইয়াকে মাথায় তুলে রাখবে, শ্রদ্ধায় ভালোবাসবে। কখনো বাধন ছিন্দের কারণ হয়ে দাড়াবে না।

রূপগঞ্জ, চারিতালুক থেকে

শুধুই স্বপ্ন

সুফিয়া জামান

সে আমায় একা ফেলে চলে গেল। অনেক দিন। যাওয়ার সময় বলেছিল, চিঠি দিও। কতো চিঠি লিখেছি, পোস্ট করা হয়নি। তার ঠিকানা আমি জানি না। সে তো আমার চেনা ঠিকানায় থাকে না।

তৃষ্ণিত চোখ দুটো তাকে খুঁজে ফিরে জনতার ভিড়ে। কোনো সংগীতের জলসায়, নববর্ষের মেলায়, রাজনৈতিক সমাবেশে, বিজ্ঞান মেলায়, রফতানি মেলায়, এমনকি স্বপ্নেও তাকে খুঁজে ফিরি। বাংলার আকাশে-বাতাসে, ভোরের বর্ণহীন সমুদ্রের শান্ত ঢেউয়ে, দূর পাহাড়ের উদাস মেঘের দেশে, ভোরের উষারাঙা শিশিরে, গোখুলির রঙিন আকাশে, শরতের পূর্ণিমা রাতে, টলটলে দীঘির জলে, বাদলা দিনে কদম তলায়, সুবাসিত ফুলে ঢাকা বিছানায় আমার পাশে কোথাও খুঁজে পাই না তাকে। তখন স্মৃতির জানালা খুলে তাকে দেখি। সে যে আছে আমার অনুভবে। জনম ধরে পতাকার মতো তার স্মৃতির ইতিহাসকে ধরে রাখবো।

ছন্দে ভরা এক বর্ষণমুখর বাসর রাতে সে আমার মুখখানা দুই হাতে অতি যতনে তুলে ধরে চোখে চোখ রেখে বলেছিল, আমি তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা আর শ্রেষ্ঠ সংসার দেবো।

সেদিন তার কণ্ঠে ছিল অঙ্গীকার আর ভালোবাসার আবেগ। তখন কি এক স্বপ্নালোকে অবাক দুটি চোখে যে তাকে দেখেছিলাম আজ সে কাছে নেই। অঙ্গীকার ভুলে আমায় একা ফেলে চলে গেল। আমার জীবন থেকে যতো আনন্দ, সুখ, স্বপ্ন সব নিয়ে গেল। আমার ভুবন থেকে বসন্তটুকুও নিয়ে গেল। ভুল করে আমার মনটাও যে তাকে দিয়েছিলাম। এখন আমি একেবারেই নিঃস্ব।

সত্যিই যদি তাকে পেতাম, আমার সুখ তাকে অর্ঘ্য দিতাম। তার সোহাগ নিতাম, তাকে সোহাগ দিয়ে। তাকে বরণ করে নিতাম ভালোবাসার বিপুল আয়োজনে।

তার রঙে নিজেকে রাঙানো এক জীবনে আমার আর হবে না জানি। তবু ভোরের স্বপ্ন দেখি, মৃদু পায়ে নীরবে সে আসে আমার কাছে। পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে আমার চোখ দুটো ধরে বলে, বলো তো আমি কে?

আমি যেন তার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে বলি, এখনো জানো না, তুমি আমার কে?

কোনো অলস মুহূর্তে যাযাদি উল্টাতে গিয়ে যদি হঠাৎ আমার নামটা তোমার চোখে পড়ে যায় আর লেখাটা পড় সে আশায় তোমাকে বলছি –

ওগো প্রিয়তম! না-ইবা রাঙালে আমার জীবন। শুধু আশীর্বাদ করো যেন আমার অন্তর সত্যের অরুণ শিখা প্রদীপের আলোতে দীপ্যমান থাকে আর অভিসার যেন হয় সত্যের পথে, সৃজনের পথে, কল্যাণের পথে যেন অমানিশার কালো আধারে ছড়িয়ে দিতে পারি মুঠি মুঠি আলো। জাতিকে শিক্ষার দ্বীপ জ্বালিয়ে শুভ্র এক সকাল যেন উপহার দিতে পারি।

গুলশান, ঢাকা থেকে

নয়ন

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। অনার্স প্রথম বর্ষে ঢাকার এক নামকরা কলেজে পড়ি। গ্রাম থেকে শহরে পড়তে এসেছি। এক পরিবারের সঙ্গে সাবলেট থাকি। একদিন এক রুমমেটের সঙ্গে আজিমপুর কমিউনিটি সেন্টার মাঠে যাই। সে সূত্রে পরিচয় হয় এক ছেলের সঙ্গে। নাম নয়ন। পরে অবশ্য তাকে আমি নয়ন ভাইয়া বলে ডাকতাম। সে আমার ছয়-সাত বছরের সিনিয়র। নয়ন ভাইয়ার তিন বন্ধু ছিল ওই মাঠে। প্রথমে তাকে দেখিনি। মাঠ থেকে আসার সময় সে এবং তার এক বন্ধু আমাকে ডেকে কথা বলে। এক পর্যায়ে বাড়ির ঠিকানা নেয় এবং তার (নয়নের) মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দিয়ে পরদিন বিকাল পাচটায় ওই মাঠে আসতে বলে।

সময়টা ছিল ২০০৫ সালের জুনে। সেই প্রথম মা-বাবাকে ছেড়ে কোথাও থাকি। তাই নিঃসঙ্গতা বড় রকমভাবে আমাকে পেয়ে বসেছিল। নয়নের কথায় সাড়া দিয়ে পরদিন আজিমপুর মাঠে গেলাম। মাঠে গিয়ে দেখি তার বন্ধু, খালাতো ভাইসহ অনেকে। অনেক কথা হলো সেদিন। আমার গান শুনলো। এক পর্যায়ে নয়নের খালাতো ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমার সঙ্গে কারো কোনো অ্যাফেয়ার আছে কি না। আমি না বললাম। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য সবার মতো নয়নকেও জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো, তার সঙ্গে কোনো মেয়ের সম্পর্ক নেই। তবে ইদানীং মনে হচ্ছে কারো সঙ্গে অ্যাফেয়ার হতে যাচ্ছে।

এভাবে অনেক কথাবার্তা হলো। এক পর্যায়ে নয়ন বললো, তাদের সঙ্গে ধানমন্ডি লেকে যাওয়ার জন্য রাজি হলাম। তবে সেদিন নয়, অন্য দিন।

পাঠক, আপনারা হয়তো বলবেন, অপরিচিতদের সঙ্গে একটু কথাবার্তায় কেন যাওয়ার জন্য রাজি হলাম? আসলে তারা মানুষ হিসেবে ভালো ছিল, তাদের সঙ্গও আমার ভালো লাগতো।

এভাবে চললো কিছু দিন। নয়নের অফিসে যেতাম আমি। সেও মাঝে মধ্যে আমাকে নিয়ে লেকের আশপাশে ঘুরতো। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে আমার ভালো লাগতো বন্ধু হিসেবে। সেও প্রথমে বলেছিল আমি তার বন্ধু। বন্ধু হিসেবে অনেক কথাই বলতাম তাকে। আমাদের মধ্যে অনেক কথা হতো। আমার তখন মোবাইল ছিল না। এক রুমমেটের মোবাইল থেকে মিসকল দিলে সে কল ব্যাক করতো এবং প্রতিদিন রাত ১২টার পর আমাকে ফোন করতো। যদি একদিন তার কাছে না যেতাম, সে যাওয়ার জন্য তাড়া দিতো। এভাবে কিছু দিন চলার পর একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করি, কি, আমাকে ভালোবাসো?

সে বললো, ভালোবাসি কি না জানি না। তবে তোমাকে না দেখলে কেমন জানি লাগে। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। রাতে তোমার কথা খুব মনে পড়ে। ইচ্ছা করে প্রতিদিন তোমার সঙ্গে দেখা করি।

তার কথা শুনে খুব হাসলাম। কথাগুলো যখন সে বললো, তখন আমরা লেকের পাড়ে। যে জায়গায় ছিলাম, সে জায়গাটাকে তারা বলতো রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার।

তাকে বললাম, আচ্ছা সত্যি করে বলো তো তুমি কখনো কোনো মেয়েকে ভালোবাসেনি?

সে বললো, তোমাকে আগেও বলছি, এখনো বলছি, না। কোনো মেয়েকে আমার বিশ্বাস হয় না। তোমাকে দেখে খুব সিম্পল একটা মেয়ে মনে হলো, তাই। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে না চাও, তবে আমি জোর করবো না।

তার কথা শুনে তাকে ভালোবাসতে রাজি হয়ে গেলাম। প্রথমে রাজি হলাম না। কিন্তু এ কথা তো সত্যি, তাকে আমার ভালো লাগতো। এভাবে চললো কয়েক দিন। সে আজিমপুর এসে আমাকে নিয়ে যেতো। আবার রিকশায় দিয়ে যেতো। রিকশায় উঠলে আমাকে এক হাত দিয়ে ধরে রাখতো, আমি যদি পড়ে যাই!

সে আমাকে প্রায়ই বলতো, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো না।

আমি তার কথা শুনে বলতাম, ছি! তুমি এগুলো কি বলো? ভালোবাসলে কি মানুষ এমন করে? সত্যি কথা বলতে কি তখন আমি আমার জীবনের আঠারোটা বছর পার করে উনিশ বছরে পা দিয়েছি। অনেক বড়ও হয়েছি। কিন্তু তখন পর্যন্তও কারো সঙ্গে মনের লেনদেন করিনি।

নয়নকে খুব ভালো লেগেছে তখন। তার অনেক পীড়াপীড়ির পর তাকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু ভালোবাসা কি তখনো বুঝিনি। সেও বলতো, তুমি আমাকে ভালোবাস। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি ভালোবাসা কি তাই বোঝ না।

পাঠক, বিশ্বাস করুন- ভালোবাসা কি তা আমি নয়নের কাছ থেকে শিখেছি। বলতে গেলে বলতে হয়, এক অক্ষর করে ভালোবাসতে তার কাছ থেকে শিখেছি। একজন প্রেমিক হিসেবে তাকে যতোটুকু ভালোবাসতাম ততোটুকুই শ্রদ্ধা করতাম। সেও আমাকে খুব স্নেহ করতো।

সে আমাকে বলতো, তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য, চুমু খাওয়ার জন্য। আমি না করলে সে হাসতো। কিন্তু জোর করতো না। সে আমাকে অনেকবার জড়িয়ে ধরেছিল, চুমু... আরো কতো কি! আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সে বলতো, দেখ ভালোবাসতে গেলে এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। আমি মন খারাপ করলে সে বলতো, তুমি সত্যিই খুব ছোট। (সে আমাকে পিচ্চি বলতো)।

সে বলতো, আমাকে না দেখলে তোমার খারাপ লাগে না? আমার প্রতি তোমার কোনো ফিলিংস হয় না? মনে হয় না, নয়নকে একটু আদর করি, জড়িয়ে ধরি। আমি এক বাক্যে বলতাম, না।

সে হাসতো আর বলতো, তুমি অনেক বড় হয়েছো ঠিক, কিন্তু তোমার মানসিক বৃদ্ধি এখনো হয়নি।

তবে আমি বুঝতাম ওই সময় সে আমাকে অনেক ভালোবাসতো। আমার চলাফেরা বা জীবন যাপন সম্পর্কে অনেক পরামর্শ দিতো। অনেক ব্যাপারে হেল্প করতো। এ জন্য আরো ভালো লাগতো তাকে। প্রায় এক দুই দিন পর পর তার কাছে যেতাম। রাত আট নয়টার পর সে আমাকে রিকশায় করে দিয়ে যেতো। কিসে আমার ভালো হবে, কিসে খারাপ হবে- এসব ব্যাপারেও অনেক বলতো। আমি মেনে চলার চেষ্টা করতাম যদিও সে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু আমি এখনো বলি, সে তখন আমাকে খুব ভালোবাসতো, খুব- খু-উ-ব।

আমিও মাঝে মধ্যে ভাবতাম, যে ছেলে আমাকে এতো ভালোবাসে, সত্যিই তো, তার প্রতি আমার কোনো ফিলিংস হবে না কেন? তাকে তো আমি ভালোবাসি। আমাকে ধরার তার অবশ্যই অধিকার আছে। আরো অনেক কথা ভাবতাম তাকে নিয়ে, সত্যিই এখন তাকে আমি খুব ভালোবাসি। একজন সত্যিকারের প্রেমিকার মতোই ভালোবাসি। তাই তো তার সঙ্গ কামনা করি। মনে হয়, এখন যদি আমাকে

একটু জড়িয়ে ধরতো, চুমু খেতো। কিন্তু যা চাই তা পাই না। এক সময় সে চাইতো আমি দিতাম না। এখন আমি চাই, সে চায় না।

আমি প্রতিদিন তার কাছে গিয়ে বসে থাকি। সে এখন আর আমার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলে না। দেখলে কেমন আছি ও পড়ালেখা কেমন হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করে। রাত হলে তার খালাতো ভাইকে বলে, আমাকে পৌছে দিতে। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগলো না। আমার সঙ্গে যেতে বললে সে বলতো, আমার সময় নেই, কাজ আছে। কিন্তু প্রায় দিনই দেখতাম, সে তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে আড্ডা দিতো।

এক সময় মনে হলো, সে আমাকে সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু আমাকে কিছু বলতো না। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার পাশে বসে থাকলেও চলে যেতে বলতো না। তার ফ্রেন্ড এলে আমার সঙ্গে কথা বলতো, সেও বলতো। কিন্তু এখন যদি আমি না-ও যাই, সে বলে না, কেন যাইনি? ভালোবাসার কথা তো দূরের কথা।

সে আমাকে ঠিক অবহেলাও করতো না। এসব আচরণে নিজেকে খুব ছোট মনে হলো। সে আমাকে যাওয়ার জন্য বলতো না অথচ আমি যেতাম। পরে অবশ্য আমি পনেরো বিশ দিন পর পর যেতাম। তবুও সে কিছু বলতো না। আমি মাঝে মধ্যে ভাবতাম, আর যাবো না।

কিন্তু পাঠক, মনকে বোঝাতে পারতাম না। আমি খুব বেশি ভালোবেসে ফেলেছি তাকে। তাকে একদিন না দেখলে আমার মনে হয় কতো দিন দেখিনি। তাই যেতাম মাঝে মধ্যে। না গেলে খুব খারাপ লাগতো। এখন নয়নের কাছে যাই না প্রায় চার মাস।

পাঠক, নয়ন যেমন আমাকে ভালোবেসেছিল এমন ভালোবাসা কখনো আমি কারো কাছ থেকে পাইনি। কিন্তু এ কেমন ভালোবাসা? তার কাছে শেষ যে দিন যাই, তার আগের দিন সে আমাকে একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বলেছিল, এই মেয়েটিকে সে ভালোবাসতো। নাম মিতু। তাকে নয়নের বিয়ে করার কথা ছিল। পরে কি কারণে নয়ন তাকে বিয়ে করেনি, আমার ঠিক মনে নেই। মিতুর কথা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। কারণ নয়ন আমাকে বলেছিল, সে কখনো আমাকে ছাড়া কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশেনি, ভালোবাসেনি। কিন্তু এখন?

আমার বুক ফেটে কান্না এসেছিল, কিন্তু কাদিনি। এগুলোর কিছুই দাম নেই নয়নের কাছে।

আমি নয়ন ছাড়া কখনো কাউকে ভালোবাসিনি। আর আগে ভাবতাম, আমি এমন একজনকে ভালোবাসবো, যে কখনো আগে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেনি। কারণ যাকে ভালোবাসবো, সে শুধু আমাকেই ভালোবাসবে। যখন জানলাম, নয়ন ভালোবাসতো মিতুকে তবুও তাকে ঘৃণা করতে পারিনি। কারণ তাকে অনেক ভালোবাসি, অ-নে-ক।

যে বাসায় থাকতাম তার ফোন নাম্বার নয়নের কাছে ছিল। আমি অভিমান নিয়ে দূরে সরে এসেছি। ভাবলাম, যদি সে কোনোদিন আমার খোজ নেয় ফোনে, তবে তার কাছে যাবো। কিন্তু আজ চার মাস শেষ হতে চললো। সে একটি বারও খোজ নিল না আমি বেচে আছি কি মরে গেছি।

তবুও তাকে ভালোবাসি আমি। শুধু জানতে চাই, সে কেন আমার সঙ্গে এমন করলো। আমার অপরাধটা কি ছিল?

নয়ন, আমি তোমাকে ভালোবাসবো আজীবন। কখনো ভুলবো না তোমায়।

I love you, I will love you till the end of time.

ইতি

সেই আমি

যে তোমাকে খুব ভালোবাসে।

নাম ঠিকানা বিহীন

লক্ষ্মীপুর থেকে